২০০১

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ □ ১ম সংখ্যা

১৫ জুলাই, ২০০১ ইসান্দ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শত বার্ষিকী (মার্চ ২৩, ১৮৮৯ – মার্চ ২৩, ১৮৮৯) উদযাপন উপলক্ষে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ গায়েনা কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক-ডাকটিকিট।

লন্ডনে বাঙ্গালী আহমদী শওকত-জাকারিয়ার বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) এবং তাঁর ডানে বর-ডঃ জাকারিয়া এবং কণের পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল হাদীকে দেখা যাচ্ছে, মে ২০, ২০০১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর মজলিসে আমেলার এক বিশেষ সভায় হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা হাফেয মোজাফ্ফর আহমদ, নায়ের দাওয়াত ইলাল্লাহ

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযল ও করমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ২৩তম মজলিসে শূরা সুসম্পন্ন হয়েছে, আল্হামদুলিল্লাহ্। এ শূরা ছিল ৩য় সহস্রাব্দের প্রথম শূরা। এ শূরাতে ন্যাশনাল আমীর ও আমেলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যার প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে হুযূর আকদস (আইঃ)-এর অনুমোদনও এসে গিয়েছে। খাকসারের ওপরে পুনরায় ন্যাশনাল এমারতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লাবিল্লাহ্।

কেন্দ্রের পাশাপাশি ৬টি স্থানীয় জামাতের এমারতের অনুমোদন এবং প্রায় সবগুলো স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তা নির্বাচনও সম্পন্ন হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে আল্লাহ্তাআলার সাহায্য সমর্থনে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ জামাতও যাতে দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হয় সে লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ বর্ষে অর্থাৎ আগস্ট ১৯৯৯ হতে জুলাই ২০০০ সাল পর্যন্ত মাত্র ১ বছরে বিশ্বে ৪ কোটি ১৩ লক্ষেরও অধিক লোক বয়াত করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত পরিসংখ্যানে বাংলাদেশের অংশ অতীব নগণ্য। হুযূর (আইঃ) চলতি বছরে বাংলাদেশকে যে বয়াতের টার্গেট নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা যাতে পূরণ হয় সেজন্যে আমি বাংলাদেশের আহমদী ভাই-বোনদের দোয়া, সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করি। আমরা সবাই যদি আল্লাহ্র ওপরে ভরসা করে দোয়ার মাধ্যমে তবলীগের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ি তাহলেই তা সম্ভব হবে।

হুযূর (আইঃ) ৪ বছর পূর্বে বাংলাদেশের ৭৪তম সালানা জলসায় বাংলাদেশের আহমদীদের উদ্দেশ্য করে যে বাণী প্রদান করেছিলেন আমি পুনরায় সে দিকে আপনাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঃ দেশের মৌলবী-মাওলানা যাদেরকে হুযূর (আইঃ) পাকিস্তানী কট্টর মাওলানাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর বলে আখ্যায়িত করেছেন, তাদের নিকট ও দেশের নেতৃবৃন্দের নিকট আমাদের যেতে হবে আহমদীয়তের পয়গাম নিয়ে। আপনারা যে যেখানেই আছেন আপনার পার্শ্ববর্তী মৌলবী মাওলানা সাহেব ও সমাজের নেতৃবৃন্দ ও জন সাধারণের নিকট আহমদীয়তের প্রকৃত চিত্রকে তুলে ধরুন। তাদের মনে এ কথা গেঁথে দিন যে, **আহমদীয়ত প্রত্যেককে আল্লাহ্র প্রকৃত সেবক ও মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) -এর প্রকৃত প্রেমিক হওয়ার শিক্ষা দেয়।**

পরিশেষে আমরা পরম করুণাময় আল্লাহ্তাআলার নিকট দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে হুযূর (আইঃ)-এর ইচ্ছানুযায়ী দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কাজ করার সৌভাগ্য দান করেন, আমীন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা

৩১ আষাঢ় ১৪০৮ বঙ্গাব্দ ২৩ রবিউস সানি ১৪২২ হিঃ কাঃ
১৫ ওফা ১৩৮০ হিঃ শাঃ ১৫ জুলাই ২০০১ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মোঃ আবুল কালাম আজাদ

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	–	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@ bol-online.com

সম্পাদকীয়

শেষ নবী এবং উম্মতী নবী

গত ১৫ই জুন, ২০০১ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকের 'ধর্মচিন্তা' কলামে 'শেষ নবী প্রশ্নে অযথা বিতর্ক' শীর্ষক জনৈক আলিমুল হক লিখিত একটি প্রবন্ধের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। লেখক বহু কসরৎ করে কুরআন, হাদীস, তফসীরের কিতাব ও বুযূর্গানে দীনের অভিমতের বরাতে এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌র পরে নবী আসতে পারে না, কেননা তিনি শেষ নবী। তিনি আহমদী জামাতের নাম না নিয়ে নবুওয়তের মসলার ব্যাপারে এ জামাতকে দোষী সাব্যস্ত করতে গলদঘর্ম হয়েছেন।

আমরা দীর্ঘদিন থেকে আমাদের পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রিকাদির মাধ্যমে একথা ঘোষণা করে আসছি যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) কখনও নিজেকে শরীয়তবাহী স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবী বা শুধু নবী বলে দাবী করেন নি। আর আমরা তাকে তা মানিও না। তিনি তাঁর 'এক গলতিকা ইযালা' পুস্তকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, *'যেখানে আমি নবী বা রসূল হওয়া অস্বীকার করিয়াছি, সেখানে ইহা এই অর্থেই করিয়াছি যে, আমি শরীয়তদাতা নবী নহি এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবীও নহি কিন্তু আমি আমার নেতা রসূলের (সঃ) আত্মিক কল্যাণ লাভ করিয়া এবং তাঁহারই নামে আখ্যায়িত তাঁহারই মাধ্যমে খোদা হইতে আমি গায়েবের জ্ঞান পাইয়াছি এই অর্থে আমি নবী ও রসূল। আমার কোন নূতন শরীয়ত নাই'* (পৃষ্ঠা ১০, ১১, বাংলা সংস্করণ)।

তিনি যা কিছু লাভ করেছেন তা তাঁর প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কল্যাণে লাভ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, *'আমার এ সম্মান শুধু হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসরণ দ্বারাই লাভ হয়েছে। আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত না হইতাম এবং তাঁহার অনুগমন না করিতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হইত, তাহা হইলেও আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হইতে পারিতাম না। কেননা, এখন মুহাম্মদী নবুওয়ত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবুওয়তের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নব বিধান (শরীয়ত) লইয়া আর কোন নবী আসিতে পারে না। কিন্তু বিধান-বিহীন নবী আসিতে পারেন, যদি তিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুগামী হয়েন এমম্বিধভাবে আমি একাধারে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত এবং নবী'* (তাযাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, পৃষ্ঠা ২৫, বাংলা সংস্করণ)।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর আগমনে তাঁর পূর্বের সর্ব প্রকার নবীর আগমনের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন কেবলমাত্র তাঁর অনুসরণ ও অনুগমনে তাঁর কল্যাণের উত্তরাধিকারী হয়ে 'উম্মতি নবী' আসতে পারে (সূরাতুন্ নিসা ঃ ৭০ আয়াত) কেবলমাত্র **ফানা ফির রসূল** বা রসূল (সঃ)-এ বিলীন হয়ে এ সম্মান লাভ করার পথ খোলা আছে। নচেৎ অন্য সব পথ বন্ধ। এটাই মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক কামালিয়্যত বা পরম জ্যোতির্বিকাশ অন্য কথায় খাতামুন্নাবীঈন। উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে অন্য কোন নবীর ভাগ্যে ইহা জোটে নি আর কারও ভাগ্যে জুটবেও না। এমন কোন নবী অতীতে হন নি যার অনুসরণ করে কেউ 'উম্মতি নবী' হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। লেখক আল্লামা ইবনে কাসীরের তফসীরের উল্লেখ করে বলেছেন, 'প্রত্যেক রসূল নবী হন কিন্তু প্রত্যেক নবী রসূল হন না।'

অবশিষ্টাংশ সূচীর পাতায় দ্রষ্টব্য

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আ'রাফ- ৭	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস ঃ নিঃস্ব গরীব মুসলমান	ঃ অনুবাদ- মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৩
❑ অমৃত বাণী ঃ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	৪ ও ১৪
❑ জুমুআর খুতবা ঃ কুরআনী আয়াতের আলোকে সিফতে বারীতাআলা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৮
❑ আধ্যাত্মিক জগতের মণি-মুক্তা	ঃ জনাব ডঃ শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ	৯
❑ অহংকারের পরিণাম	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	১০-১১
❑ প্রশ্ন-উত্তর	ঃ নির্বাহী সম্পাদক	১২
❑ ছোটদের পাতা ঃ নেসাবে ওয়াক্‌ফে নও (১৪-১৫ বছরের বালক-বালিকাদের জন্যে পাঠ্য-সূচী)	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৩-১৪
❑ নতুনদের পাতা ঃ		
হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম দরদ্	ঃ সংকলন ও অনুবাদ- জনাব কাওসার আলী মোল্লা	১৫-১৭
ইসলামে নারীর মূল্যায়ন	ঃ জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	১৮-১৯
বিনয় ও নম্রতাই মনুষত্বের মূল উপাদান	ঃ মৌলবী মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম	২০-২১
❑ সংবাদ	ঃ	২২-২৩

প্রচ্ছদ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)

[সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ]

তাহলে দেখা যায় লেখকের দৃষ্টিতে রসূলের মর্যাদা নবীর চেয়ে নিম্ন স্তরের। এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন-আল্ কুরআন রসূলে করীম (সঃ)-কে 'খাতামান্নাবীঈন' অর্থাৎ শেষ নবী বলেছে আর হাদীসে রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, 'লা নাবীয়া বা'দী' অর্থাৎ আমার পরে নবী নেই। সুতরাং এ কথা কি বলা যায় না যে, নবী করীম (সঃ)-এর পর রসূল শেষ নয় বা তিনি খাতামুল মুরসালীন নন অথচ একথা কোথাও বলা হয় নি। অতএব তাদের আকিদা মতে রসূল আসতে পারে? আর এ আকিদা খুবই মারাত্মক (আল্ আয়াযু বিল্লাহ্)। আরও আশ্চর্যের বিষয়, লেখক একদিকে নবী করীম (সঃ)-কে শেষ নবী বলেন, 'তাঁহার পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবীর আগমন ঘটিবে না। কেবল ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমন' ব্যতীত। মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পরে যদি ঈসা (আঃ) আসেন তাহলে শেষ নবী কে হন? লেখক বলবেন, তিনি তো আগে এসেছেন। লেখক কি নবী করীম (সঃ)-কে 'আওওয়ালে' আবির্ভূত বলে বিশ্বাস করেন না? সে ক্ষেত্রেও মুহাম্মদ (সঃ) পরে এসেও শেষ নবী হন কি করে? রসূলুল্লাহ্র (সঃ) পরে তাঁর (সঃ) একজন গোলাম আগমন করলে ঈমান আমলের 'বারোটা বাজে' কিন্তু একজন বনী ইসরাঈলী নবী আগমন করলে 'বারোটা বাজে' না।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পরে 'তাঁর একজন উম্মত ইমাম মাহ্দী (আঃ) প্রথম দজ্জালের মোকাবেলা করতে পারবেন না পরে ঈসা (আঃ) এসে দাজ্জাল ও তার সহযোগীদের ধ্বংস করবেন' - একথা বলেছেন খতীব মাওলানা উবায়দুল হক সাহেব গত ২৯শে জুন, ২০০১ বায়তুল মোকাররম মসজিদে খুতবা দিবার সময় (দৈনিক সংগ্রাম ॥ ৩০.৬.২০০১)। বলিহারি! এসব বিশ্বাস দ্বারা ঈমান আমলের 'বারোটা বাজে' না কি? কী বলবেন, ইত্তেফাকের প্রবন্ধকার? উল্লেখ্য, সহী বুখারীতে দু'জন ঈসার হুলিয়া বর্ণনা করা হয়েছে; একজন মসীহ্ নাসেরী আর অপরজন মসীহুদ দাজ্জাল!

খতীব উবায়দুল হক সাহেব কাদীয়ানীদের 'প্রতিহত করা মুসলিম সমাজের কর্তব্য, বলে খুতবা দিয়েছেন শুধু এ কারণে যে, আহমদী মুসলমানরা কুরআন, হাদীস ও বুযূর্গানদের কথার ভিত্তিতে এ বিশ্বাস রাখেন যে, বনী ইসরাঈলী নবী ঈসা (আঃ) স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছেন। আমরা খতীব সাহেবকে এ প্রশ্ন কি করতে পারি না যে, সূরা সাফ্‌ফে হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, আমার পরে 'আহমদ' নামের একজন রসূল আসবেন (আয়াত ঃ ৭)। যদি ঈসা (আঃ) মারা না গিয়ে থাকেন তাহলে 'আহমদ' রসূল অর্থাৎ মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কীভাবে আসেন? এ বিশ্বাস দ্বারা উবায়দুল হক সাহেবরা কি তামাম মুসলমানদের ঈমানের 'বারোটা বাজিয়ে' ছাড়ছেন না। 'কাদিয়ানীদের প্রতিরোধ' করার ফতোয়া দেবার পূর্বে খতীব উবায়দুল হক সাহেবের কি দেখা উচিত ছিলো না যে, আল্ আযহারের প্রধান সহ তার অনেক মুরব্বীও যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে কাদিয়ানীদের মতই পোষণ করেন?

ইত্তেফাকের প্রবন্ধকার এসব ব্যাপারে অবহিত হওয়ার জন্যে পরিশেষে জনাব আখতার উল আলমের পুস্তকাদি পড়তে উপদেশ দিয়েছেন। আমাদের বক্তব্য, এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত মুল্লাআলী কারী (রহঃ) সহ মধ্য যুগীয় বিশেষ বিশেষ বুযূর্গদের অভিমত উপেক্ষা করেও কি আমরা জনাব আখতারুল আলমের মতামতকে প্রাধান্য দিবো? আর খতীব উবায়দুল হকরা কি বলবেন, এসব বযূর্গদের প্রতিহত করাও কি আপনাদের কর্তব্য নয়?

- নির্বাহী সম্পাদক

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল আ'রাফ - ৭

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا
بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ
لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭। এবং তাদের উভয়ের মধ্যে একটি পর্দা থাকবে এবং আ'রাফে[৯৭৮] কিছু সংখ্যক পুরুষ থাকবে, যারা সকলকে তাদের চিহ্ন দেখে চিনতে পারবে। এবং তারা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে, 'তোমাদের উপর 'সালাম', যদিও তখনও পর্যন্ত তারা সেখানে প্রবেশ করবে না,[৯৭৯] কিন্তু তারা (এর) আশা করতে থাকবে।

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا
لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٨﴾

৪৮। এবং যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের প্রতি ফিরানো হবে তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে যালেম জাতির অন্তর্ভুক্ত করো না।' রুকূ-৫

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ
قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯। আর আ'রাফে অবস্থানকারীরা সেই লোকদেরকে ডাকবে যাদেরকে তারা তাদের চিহ্ন দেখে চিনবে[৯৮০] (এবং) বলবে, তোমাদের দল তোমাদের কোন কাজে এলো না, এবং তা-ও (কাজে এলো) না তোমরা যার অহংকার করতে।

أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ
ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٥٠﴾

৫০। এরাই কি তারা, যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে, আল্লাহ্ কখনও তাদের সাথে রহমতপূর্ণ ব্যবহার করবেন না? (তাদেরকে আল্লাহ্ বলবেন), 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় থাকবে না আর তোমরা মর্মাহতও হবে না।'

৯৭৮। "আ'রাফ" বহুবচন, একবচনে "উরফ" অর্থ-উন্নত বা "মর্যাদাপূর্ণ স্থান'। আ'রাফা আলাল কাওম" অর্থাৎ সে তাদের পরিচিত বিধায় সে তাদের ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক ছিল বা হলো। বিশিষ্ট সম্মানিত এবং উচ্চ মর্যাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকেই সাধারণতঃ উচ্চ এবং উন্নত স্থানে উপবিষ্ট করানো হয়ে থাকে। হযরত হাসান এবং মুজাহিদ (রাঃ)-এর মতানুসারে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণই মু'মিনদের মধ্যে সেরা, বাছাইকৃত এবং উচ্চ মার্গের জ্ঞানী বুযূর্গ, কিরমানীর মতে তাঁরা শাহাদত বরণকারী। অন্যান্য অনেকে মনে করেন যে, তারা হবেন নবী এবং এটাই সর্বতোভাবে সঠিক বলে মনে হয়। উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ কেবল উৎকৃষ্টতর ধারণাই রাখবেন না, অধিকন্তু সম্মানিত এবং উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে থাকার কারণে তারা অধিকতর ওয়াকিফহালও হবেন। প্রত্যেককে দেখেই তাঁরা তার পদমর্যাদা, স্তর বা অবস্থান বুঝাতে পারবেন। এটা একটি ভুল ধারণা যে, 'আ'রাফে' আসীন বা উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি মাঝারি বা মধ্যম শ্রেণীর ও মর্যাদার লোক হবেন, যাদের সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত কোনো স্থির সিদ্ধান্ত হয় নি, যেন তাদের বিষয় বিবেচনাধীন রয়েছে। এরূপ অর্থাৎ মধ্যবর্তী লোকদেরকে উচ্চ স্থানে আসীন করার মধ্যে কোন যুক্তি নেই কেননা, সেক্ষেত্রে শহীদ ও নবীগণ নিম্নস্তরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন।

৯৭৯। এ শব্দগুলি ভাবী জান্নাতবাসীদের প্রতি ইশারা করছে, যারা তখনও তাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করে নি, কিন্তু শীঘ্রই প্রবেশ করবেন বলে আশা করতে থাকবেন। উচ্চ স্থানে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ তাদেরকে জান্নাতবাসী বলে চিনতে পারবেন, যদিও সেই সকল লোক তখনও পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করেন নি।

৯৮০। 'উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ' স্থানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ আল্লাহ্র নবীগণ, যাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কতক লোককে বিশেষ চিহ্ন দেখে চিনতে পারবেন এবং তাদেরকে ডেকে বলবেন যে, এতক্ষণে তারা নিশ্চয়ই তাঁদের বিরুদ্ধাচরণের দুঃখময় পরিণতি উপলব্ধি করতে পেরেছে।

৯৮১। এ সকল লোক দ্বারা জান্নাতের ভাবী অধিবাসীবৃন্দকে বুঝাচ্ছে। নবীগণ দোযখবাসীদেরকে সম্বোধন করে বেহেশ্তের ভাবী অধিবাসীদের দুর্বল-দরিদ্র মু'মিনদেরকে ডেকে বলবেন, যাদেরকে তারা তুচ্ছ ভেবে উপহাস করতো এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "এরাই কি এই সকল লোক যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে, আল্লাহ্ কখনও তাদের সাথে রহমতপূর্ণ ব্যবহার করবেন না?"

হাদীস শরীফ

নিঃস্ব গরীব মুসলমান

কুরআন ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ
تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٩﴾

অর্থ ঃ "আর তুমি ধৈর্য সহকারে নিজেকে তাদের সাথে (সংযুক্ত) রাখো যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে তাঁর সন্তোষ লাভের আশায় সকালে ও সন্ধ্যায় ডাকে এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় তোমার চক্ষু যেন তাদেরকে পিছনে ফেলে আগে বেড়ে না যায়; আর তুমি তার আনুগত্য কোরনা যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে উদাসীন করে দিয়েছি এবং সে হীন বাসনার অনুসরণ করেছে ও যার বিষয় সীমা ছাড়িয়ে গেছে (১৮ঃ২৯)।

হাদীস ঃ

আন হারেসাতাবনে ওয়াহবিন কালা সামি'তু রসূলাল্লাহি সালআমা ইয়াকুলু আলা উখবিরুকুম বিআহলিল জান্নাতি কুল্লু যাইফিন মুত্তাযা'আফিন লাও আকসামা আলাল্লাহি লাআবাররাহু আলা উখবিরুকুম বিআহলিন্নারি কুল্লু উতুল্লিন জাওওয়াযিন মুসতাকবিরীন (মুত্তাফাকুন আলায়হে)।

অনুবাদ ঃ হারেসা ইবনে ওয়াহব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ধরনের লোক বেহেশ্তি হবে আমি কি তা তোমাদের বলব না? প্রত্যেক গরীব ব্যক্তি যাকে লোকেরা দুর্বল ও তুচ্ছ জ্ঞান করে। সে যদি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে শপথ করে তবে আল্লাহ্ তা অবশ্যই পূর্ণ করে দেন। তিনি (সঃ) বললেন, কোন্ ধরনের লোক জাহান্নামে যাবে আমি কি তা তোমাদের বলব না? প্রত্যেক নাদান, মূর্খ ও অহংকারী ব্যক্তি দোযখে যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ

মানুষের জন্য আল্লাহ্তাআলা এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনি পৃথিবীকে বিভিন্নভাবে সাজিয়েছেন। মানুষের ভোগের বহু উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। এই ভোগ-সামগ্রীর লোভ

লালসায় মত্ত হয়ে মানুষ তার স্রষ্টাকে ভুলে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা দাজ্জালের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, তারা এ দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতায় মত্ত হবে, ধন-সম্পদের মালিক হবার কারণে তারা সেই ধন সম্পদকে ভালো কাজে না লাগিয়ে ভোগ বিলাসিতার নতুন নতুন উপকরণ উদ্ভাবনে ব্যয় করবে। ধন-সম্পত্তি মানুষের জন্য পরীক্ষার কারণ। বেশী হলেও অসুবিধা না হলেও অসুবিধা।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, জান্নাতের অধিকাংশই হবে গরীব লোক। নবীদের জীবনী দেখলে দেখা যায়, তাঁদের উপর গরীবরাই প্রথমে ঈমান আনে। এ সৌভাগ্য গরীবদের হয়ে থাকে। দারিদ্র মানুষের হৃদয়কে নরম করে, বিনয়ী করে। কারণ তারা দুঃখ ও কষ্টকে অনুধাবন করেও বুঝে যে দারিদ্র-বেদনা কী? কিন্তু যারা প্রাচুর্যের মাঝে জীবন যাপন করে তারা দুঃখ-কষ্ট ও বেদনা বুঝে না। পিপাসা বা ক্ষুধার যাতনা কী অথবা চিকিৎসার প্রয়োজনে যা অন্যান্য আবশ্যকীয় কর্মে টাকা-পয়সার অভাবের বেদনা কী এটাও তারা জানে না। প্রাচুর্য মানুষকে কঠোর অহংকারী করে তুলে।

হযরত নবী করীম (সঃ) তাই তার উম্মতকে সাবধান করে দিচ্ছেন যে, প্রাচুর্যে তোমরা খোদাকে ভুলবে না। নামায, রোযা, হজ্জ যাকাত বিত্তবানের অহং, আমিত্বকে শেষ করার মাধ্যম হিসেবে রয়েছে। তাই তোমরা ইসলামের শিক্ষার উপর আমল কর। গরীবকে অবজ্ঞা করো না। তাদের সাথে খোদা আছে। খোদা তোমাদের সাথেও থাকবেন যদি তোমরা নিজেদের কর্ম দ্বারা, চরিত্র দ্বারা তাঁকে দূরে না ঠেলে দাও।

তাই আসুন ইসলামের শিক্ষাকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করি। ধন-সম্পদের লোভ না করে স্বল্পেতুষ্ট হই ও এক খোদার বান্দা হয়ে বিনয়ী ও নম্র হয়ে খোদার দরবারে উপস্থিত হই।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

চন্দ্র গ্রহণ সূর্য গ্রহণ

আগমনকারীর এই নিদর্শনও রয়েছে যে, তখন রমযান মাসে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হবে। আল্লাহ্‌তাআলার নিদর্শনের বিদ্রূপকারী খোদার সাথে বিদ্রূপ করে থাকে। তার দাবীর পর সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ সংঘটিত হওয়া এমন একটি বিষয় যা মিথ্যা ও জালিয়াতির সাথে দূরতম সম্পর্কও রাখে না। এর আগে এরূপভাবে কোন সূয চন্দ্র গ্রহণ হয় নি। এটি এমন একটি নিদর্শন ছিল যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলা সারা দুনিয়াতে আগমনকারীর ঘোষণা দিতে চেয়েছিলেন। সুতরাং আরববাসীগণও এই নিদর্শন দেখে নিজেদের ধারণামত একে সঠিক বলে মত প্রকাশ করেছে। এই ঘোষণা দেবার জন্য আমাদের বিজ্ঞাপন সে সকল স্থানে পৌছুতে পারে নি এ সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ সেখানে আগমনকারীর সময়কাল ঘোষণা করে দিয়েছে। এটা খোদাতাআলার নিদর্শ যা কিনা মানবীয় পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বাইরে ছিল। যে কোন পর্যায়ের দার্শনিক তিনি হোন না কেন গভীরভাবে চিন্তা করে তাকে ভেবে দেখতে হবে যে, নির্দ্ধারিত নিদর্শন যেহেতু পূর্ণ হয়ে গেছে, তাহলে এটা আবশ্যক যে, এর কোন প্রমাণও কোথায় থাকবে। এটা এরূপ বিষয় ছিল না যা হিসাবের আওতায় পড়ে। যেরূপভাবে বলা হয়েছে- এটা ঐ সময় ঘটবে যখন মাহ্‌দী হবার দাবীকারক কেউ হবেন। রসূলে করীম (সঃ) একথাও বলেছেন যে, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সেই মাহ্‌দী পর্যন্ত এরূপ ঘটনা আর ঘটে নি। ইতিহাস থেকে কেউ প্রমাণ করতে পারলে আমি তা মেনে নেবো।

পুচ্ছ বিশিষ্ট নক্ষত্রের উদয়

আরো একটি নিদর্শনও ছিল যে, তখন লেজও-য়াবালা নক্ষত্রের উদয় হবে অর্থাৎ ঐ সময়কার নক্ষত্র যা আগে উদিত হয়ে গেছে অর্থাৎ মসীহ্ নাসেরীর যুগে এখন সেই নক্ষত্রই উদিত হয়ে গেছে, যা ঐশী নিয়মে ইহুদীদের মসীহ্ এর আগমনবার্তা দিয়েছিল। অনুরূপভাবে কুরআন শরীফ থেকেও অবগত হওয়া যায়- এবং যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলো পরিত্যক্ত হবে, এবং যখন বন্যজন্তুগুলোকে সমবেত করা হবে, এবং যখন নদ-নদী ও সমুদ্রগুলোকে (একটিকে অন্যটির মধ্যে) প্রবাহিত করে দেয়া হবে, এবং যখন (বিভিন্ন জাতির) লোকদেরকে একত্র করা হবে, এবং যখন জীবন্ত সমাধিস্থ বালিকা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? এবং যখন পুস্তক-পুস্তিকা (ব্যাপকভাবে প্রকাশিত ও) বিস্তৃত করা হবে" (৮১ঃ৫-১১)। অর্থাৎ ঐ যুগে উটনী বেকার হয়ে যাবে। অতীতের তথাকথিত উন্নত মানের যান-বাহন ও যাতায়াতের ব্যবস্থার চাইতে এই যুগের যান-বাহন এত উন্নত ধরনের হবে যে, ঐ অতীত যুগের বাহন পরিত্যক্ত হবে। এ দ্বারা ট্রেন চলাচলের যুগকে বুঝানো হয়েছিল। কেয়ামতের সাথে এই আয়াতের সম্পর্ক একথা যারা মনে করেন তারা এটা ভেবে দেখেন না যে, কেয়ামতের উটনীগুলো কীভাবে গর্ভবতী হবে! কেননা 'ইশার'-এর অর্থ হচ্ছে "গর্ভবতী উটনী"। তারপর বলা হয়েছে "এই যামানায় চতুর্দিকে নদী-নালা বের করা হবে, এবং বহুল পরিমাণে পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হবে"। আসল কথা হলো নিদর্শনাবলী এই যামানার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।

মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিকাশস্থল

এখন বাকি রইল স্থান সম্বন্ধে। স্মরণ রাখতে হবে, দাজ্জালের আবির্ভাব পূর্ব দিকে হবে, বলা হয়েছে। এতদ্দ্বারা আমাদের দেশকে বুঝায়। সুতরাং হুজাজুল কেরামার গ্রন্থকার লিখছেন- হিন্দুস্থানে দাজ্জালের ফেৎনার (উপদ্রব) দৃষ্টি হতে যাচ্ছে। এবং এটাও সুস্পষ্ট যে, দাজ্জাল যেখানে থাকবে সেখানেই মসীহের আবির্ভাব ঘটবে। আর সেই গ্রামের নাম 'কাদেয়া' বলা হয়েছে যা কাদিয়ানের সংক্ষিপ্ত নাম।

(অবশিষ্টাংশ ১৪-এর পাতায় দ্রষ্টব্য)

রহীম সিফতের আরো বিশদ বিবরণ

[সৈয়্যদনা ওয়া ইমামানা হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা তাহের আহমদ, (আইঃ) প্রদত্ত খুতবা জুমুআ ২৫ মে, ২০০১ইং তারিখ, মসজিদে ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তাআওউয ও সূরা ফাতিহার পর হুযূর (আইঃ) খুতবা দেন।

'রহীম' সিফত সম্পর্কে আলোচনা করছি। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কুরআন শরীফের ৪২ টি আয়াতে 'রহীম' সিফতের উল্লেখ আছে। সূরা তওবার প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম' এর উল্লেখ হয় নি বাকী সকল সূরার আরম্ভে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' উল্লেখ আছে। আবার সূরা 'নামল' এর ভিতর একবার 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'-এর উল্লেখ রয়েছে। এ সম্পর্কে আমি গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ পাই নি যে, কেন এ রকম হয়েছে? আপনাদের যদি কারো কিছু জানা থাকে এ বিষয়ে আমাকে জানাবেন। প্রত্যেক সূরার প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহ্'র উল্লেখ আছে, এক সূরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ্ নেই, তার বদলে আর এক সূরার মাঝ খানে বিসমিল্লাহ্ রাখা হয়েছে। এভাবে ১১৪ বার পুরো হয়েছে। এটা তো (বাহ্যতঃ) অসম্ভব মনে হয় যে, বিসমিল্লাহ ছাড়াই কোন সূরা হবে।

এবার আমি কিছু আয়াত আপনাদের পড়ে শুনাচ্ছি।

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۚ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

অর্থ ঃ আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে কষ্ট দেন তাহলে তিনি ব্যতীত কেউ উহার মোচনকারী নেই এবং যদি তিনি তোমার মঙ্গল করতে চান তাহলে তাঁর ফযলকে রদ করারও কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। আর তিনি অতীব ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী (সূরাতু ইউনুস ঃ ১০৮)।

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি কেউ কষ্ট পায় তবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ তার কষ্ট দূর করতে পারে না। হ্যাঁ, আল্লাহ্ অবশ্যই তা দূর করতে পারেন। এখানে একটি আশার আলো সকলের জন্যই আছে।

তারপর বলা হয়েছে আল্লাহ্ যদি কারো জন্য মঙ্গল চান তবে আল্লাহ্‌র ঐ মঙ্গল প্রাপ্তির পথে কেউ বাধা হতে পারে না। অবশ্যই ঐ মঙ্গল সে পাবেই পাবে। এখানে কোন 'ইল্লা' ব্যবহার হয় নি অর্থাৎ আল্লাহ্ যে ফযল কাউকে প্রদান করতে চেয়েছেন, তিনি নিজেও সে ফযল প্রদানে বিরত থাকেন না। 'লা রাদ্দা লিফায্‌লিহী' -তার ফযল (অনুগ্রহ) প্রাপ্তির পথে কোন বাধা থাকে না এ সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত,যারা অনেক পাপ-পংকিলতায় নিমজ্জিত রয়েছে, হতাশ হয়েছে, তাদের সম্পর্কেও আল্লাহ্‌র আদেশ এই যে, তারাও যেন নিরাশ না হয়। কারণ আল্লাহ্ অনেক বেশী ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী।

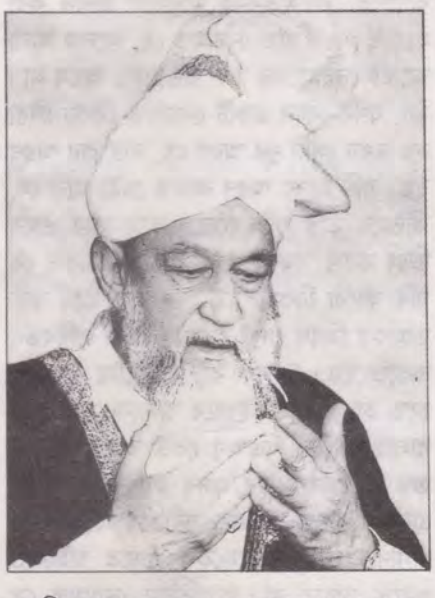

সূরা হিজর এর ৫০-৫১, আয়াতে বলা হয়েছে **'নাবির ইবাদী আন্নী আনাল গফুরুর রহীম'** আমার বান্দাদেরকে বলে দাও যে, আমি অনেক বেশী ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী। "ওয়া আন্না আযাবী হুয়াল আযাবুল আলীম।" কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার আযাবকে ভয় কর। আমার আযাব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।'

এখানে "তা সত্ত্বেও" অনুবাদ এজন্য করা হয়েছে যে, আমি গফুর রহীম হওয়া সত্ত্বেও আমি আযাব দিয়ে থাকি। অর্থ এই যে, আমি গফুরুর রহীম ছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার ক্ষমাশীলতা ও দয়ার প্রবণতা থেকে তারা ক্ষমা ও দয়া প্রার্থী হয় নি। সুতরাং আমার আযাবকে ভয় কর।

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ۝
وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝
وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

অর্থ ঃ আর গবাদিপশু ওদেরকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন, যাদের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তাপের উপকরণ ও নানাবিধ উপকার নিহিত আছে এবং তাদের মধ্যে কোন কোনটিকে তোমরা খেয়ে থাক। এবং ওদের মধ্যে তোমাদের জন্যে রয়েছে সৌন্দর্য যখন তোমরা ওগুলোকে চারণ ভূমি থেকে গোধূলী লগ্নে (ঘরে) নিয়ে আস ও যখন তোমরা ওগুলোকে প্রভাতে চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও তখনও। আর তোমাদের বোঝা বয়ে দূরবর্তী শহর-বন্দরে নিয়ে যায় যেখানে তোমরা নিজেদেরকে কঠিন ক্লেশে না ফেলে পৌঁছতে পার না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক অতীব মমতাশীল ও বার বার কৃপাকারী (সূরাতুন্নাহলঃ ৬-৮)

এখানে বলা হয়েছে গবাদি পশু থেকে তোমরা তাপ পেয়ে থাক। একথা কেবল অতীত কালের কথা নয় আজকের যুগেও উল থেকে, চামড়া থেকে গরম কাপড় বানানো হয়। ফলে প্রচন্ড শীতেও আমরা পশুর উল ও চামড়া থেকে উষ্ণতা লাভ করি। অনেক সময় দেখবেন অনেক মানুষ পশুর চামড়ার জ্যাকেট ব্যবহার করে যা খুব গরম হয়। সুতরাং আল্লাহ্ এমন অনেক ব্যবস্থা করেছেন যা তার রহমানীয়তের পরিচায়ক।

তারপর বলা হয়েছে, তোমাদের জন্য রয়েছে সৌন্দর্য যখন তোমরা এ সব পশুকে সন্ধ্যার গোধূলী বেলায় চারণ ভূমি হতে ফেরত নিয়ে আস আবার যখন সকাল বেলায় তাদেরকে চরাবার জন্য নিয়ে যাও।

যারা দেখেছেন তারা জানেন যে, এ দৃশ্য কত মনোহর! যারা সকালে প্রাতঃভ্রমণে বের হন তারা দেখেছেন, বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলে গরু, মোষ, ভেড়া ইত্যাদি চরতে থাকে, দেখতে খুবই নয়নাভিরাম হয়, মনোমুগ্ধকর হয়।

তারপর বলা হয়েছে, এসব পশু তোমাদের বোঝা বহন করে। অনেক সহজে তোমরা নিজেদের জিনিষ-পত্র এদের দ্বারা স্থানান্তর কর। অনেক কঠিন ও দুর্গম পথেও বিশেষ করে খচ্চর বোঝা বহন করে যেখানে যান্ত্রিক গাড়ীও যেতে পারে না। অত্যন্ত দুর্গম সরু পথেও এরা চলতে পারে। এটি আল্লাহ্‌র কত বড় অনুগ্রহ! এখানে আল্লাহ্‌র সিফাত **রউফুর রহীম** বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ বড়ই মমতাশীল, বার বার কৃপাকারী । এত সুন্দর দৃশ্যের কথা বলা হয়েছে, যা সত্যিই অতুলনীয়। একদিকে যেমন প্রয়োজনীয়। তেমন সুদৃশ্য চিত্র অংকণ করা হয়েছে যে, গবাদি পশু থেকে বিভিন্ন প্রকার উপভোগ্য বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

সুতরাং এখানে **গফুরুর রহীম** না বলে **রউফুর রহীম** উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক বেশী মমতাময় ও বার বার কৃপাকারী।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) উক্ত আয়াতে সম্পর্কে জংগে মুকাদ্দাস-এ (পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথমের সাথে বাহাস) একটি দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেছেন। হুযূর (আঃ)-এর লেখাটি পুরোটা পড়তে অনেক সময় ব্যয় হবে। তাছাড়া লেখাটি পড়তে গেলে প্রায় প্রত্যেক বাক্যেরই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে। সুতরাং কিছুটা সারাংশ এই যে, তর্কের বিষয় ছিল এই যে, "আল্লাহ্‌তাআলা কি আদেল, ন্যায়-বিচারক, অথবা মমতাময়, বার বার কৃপাকারী?

খ্রীষ্টানরা বলেছেন, 'আল্লাহ্ আদেল বা ন্যায় বিচারক তাই দয়াপরবশ হয়ে ক্ষমা করতে পারেন না।'

এটি একটি বড়ই মিথ্যা ও বিবেক বিবর্জিত ধর্ম-বিশ্বাস। মূলতঃ তারা হযরত মসীহ্ ঈসা (আঃ)-কে ঈশ্বর পুত্র প্রমাণ করার জন্য এহেন অজুহাত সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু আল্লাহ্ ক্ষমা করতে পারেন না সেহেতু তিনি নিজ পুত্রের কাঁধে সমগ্র মানবমন্ডলীর সমস্ত পাপের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। এখানে পুত্র নিষ্পাপ। পুত্রের কাঁধে অন্যের পাপের বোঝা চাপানো এটিও তো একটি ন্যায়-বিচার বা আদল বিরোধী কাজ! এমন একটি মূর্খতা যা ন্যায় বিচারের নামে ন্যায়-বিচারকে ধ্বংস করার সমতুল্য। তাদের দাঁড়াবার ঠাই নেই। সম্পূর্ণ অর্থহীন একটি ধর্মবিশ্বাস তারা দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছে। সবচে' বড় পূত-পবিত্র নিষ্পাপ ব্যক্তির ঘাড়ে সমস্ত মানুষের পাপের বোঝা চাপানো এ সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং অনেক বড় অবিচার।

আজকাল দেখুন, কতবড় যুলুম, অত্যাচার হচ্ছে। অনেকে এত বড় স্বৈরাচারী হয় যে, পুরো জাতির উপর যুলুম করে। অনেকে ছোট ছোট শিশুর উপর পাশবিক অত্যাচার করছে। সব দেশেই এসব হচ্ছে। ইংল্যান্ডে, আমেরিকায় প্রাচ্যের দেশসমূহেও অনেক বেশী সংখ্যায় হচ্ছে। এই সমস্ত যুলুম অত্যাচার কি হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ)-এর কাঁধেই চাপানো যাবে? নাউযুবিল্লাহ্‌মিন, যালিক (আমরা এ থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই) আর এদের সবাই মুক্তি পেয়ে যাবে? অত্যন্ত ব্যর্থ একটি ধর্ম-বিশ্বাস যাকে কোন মতেই প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

সূরা নাহলের আয়াতে বলা হয়েছে, আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামত বা অনুগ্রহরাজীকে গুণতে চেষ্টা কর তবে কখনও সম্ভব হবে না। অগণিত নেয়ামতসমূহ মানুষকে প্রদান করা হয়েছে। এত এত নেয়ামত যে, অনেক সময় অনেক নেয়ামতের কথা চিন্তাতেও আসে না। হ্যাঁ, যখন কোন একটি নেয়ামত কেড়ে নেয়া হয় তখন সেটি খুব স্মরণ হয়, বার বার স্মরণ হয়। যদি মানুষ স্মরণ করতে চেষ্টা করে যে, কীভাবে তার সৃষ্টি হয়েছে তবে তার এমন চিন্তা করার সময়ই হয় না। কিন্তু ধরুন যে যদি কারো কিডনী নষ্ট হয়ে যায় তবে কত ভয়ংকর বিপদ দেখা দেয়। কিড্‌নী পরিবর্তন করতে হয়। অনেক বড় সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। ঐ একইভাবে অন্যান্য সব রোগ বালাই আছে। যতক্ষণ কেউ অসুস্থ না হয় ততক্ষণ নেয়ামতের কদর হয় না। সুতরাং একজন মানুষ নিজের শরীরের মধ্যে এত অগণিত নেয়ামত যেকেউ গুণ্‌তে চাইলেও গুণ্‌তে পারবে না। অপরিসীম নেয়ামত সে ভোগ করছে।

মিষ্টি জাতীয় খাদ্য কীভাবে সে হজম করে এর জন্য কী সুন্দর ও নিখুঁত ব্যবস্থা চালু করে রেখেছেন আল্লাহ্। অনুরূপভাবে সে যখন শরীরের সুব্যবস্থার বিপরীত অনিয়ম কোন কান্ড করে ফেলে তখন তা থেকে নিরাময় বা পরিত্রাণ পাবার জন্যও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবে প্রত্যেক পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবার এবং তওবা করে পরিশুদ্ধ হবার বিধান রাখা হয়েছে। মানুষ বার বার পাপ কর্মে লিপ্ত হয়, তারপর বার বার ক্ষমা পেয়ে যায়। সারাংশ এই যে, **ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহীম** আল্লাহ্ অনেক বেশি ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী।

সূরা নাহল ৪৬-৪৮ আয়াতে বলা হয়েছেঃ তারা কি মনে করে যে, তাদেরকে ভূ-গর্ভে প্রোথিত করে বিলীন করে দেয়া যেতে পারে না।

যে কোন ভূমিকম্পের ফলে এমন হতে পারে। অতীতে অনেক অনেক জনবসতিকে ভূ-গর্ভে প্রোথিত করে বিলীন করে দেয়া হয়েছে।

অনেক আযাব তো হঠাৎ করেই এসে যায়। মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। হঠাৎ আযাব এসে যায়। অনেক সময় রাস্তা চলার পথে পা ফস্‌কে পড়ে যায় আর সে সাথেই কোন গাড়ী এসে তাকে পিষ্ট করে ফেলে। বাড়ী থেকে বের হবার পূর্বে সে চিন্তাও করতে পারে নি। যদি একটু সামান্যও তার চিন্তা আসত তবে তো বাড়ী থেকে বেরই হত না। এ ধরনের এত প্রকার আযাব এসে যেতে পারে যে, যেমন আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে গণনা করা সম্ভব নয়, তেমনই আযাবের প্রকার ভেদও গণনা করা সম্ভব না।

তারা কেন বুঝতে পারে না যে, আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করা যায় না। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পাকড়াও হবার অগণিত পথ আছে। তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশকে ব্যর্থ করার শক্তি রাখ না। আল্লাহ্‌র বিধানে এমনও আছে যে, তিনি মানুষকে আস্তে আস্তে পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংস মুখে পতিত হতে পথ করে দেন। অনেক জাতি অতীতে এমন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যারা ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে চলে গেছে। তাদের অনেকের নামও মুছে গেছে অথবা অনেকের চিহ্ন রয়ে গেছে আযাবের নিদর্শনস্বরূপ।

অস্ট্রেলিয়ার এবোরোজিনস্ আদিবাসী-দেরকেই দেখুন। এককালে তারা সমগ্র দেশে বিচরণ করেছে। ক্ষমতাশালী ছিল তারাই। এমন সময় আসল যে, এখন তাদের কেবল চিহ্নই রয়ে গেছে। সংখ্যায় কমতে কমতে এখন কেবল চিহ্নস্বরূপ কিছু সংখ্যক রয়ে গেছে। অনুরূপভাবে আমেরিকার 'রেড ইন্ডিয়ানরা' আছে। এভাবে আরো অনেক জায়গায় অনেকের কেবল চিহ্ন রয়ে গেছে। রোমানরা এ রকম এখন খুব দুর্বল অবস্থায় আছে। আল্লাহ্ জানেন তারা কোন্ অপরাধের কারণে বর্তমান অবস্থায় পরিণত হয়েছে। তাদের কোথাও ঠাঁই নেই।

এগুলো হচ্ছে সেই ধরনের নিদর্শন যে, আল্লাহ্ ধীরে ধীরে তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। যেমন চাঁদ ছোট হতে হতে এক

সময় অদৃশ্য হয়ে যায়। আল্লাহ্ আস্তে আস্তে পাকড়াও করেন। হঠাৎ করে একদম শেষ করেন না। সুতরাং পাকড়াও করার বিভিন্ন ধরনের কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে সাথে বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক বড়ই ক্ষমাশীল এবং বার বার কৃপাকারী।

যদি তিনি তোমাদের প্রত্যেক পাপের সাথেই পাকড়াও করতেন তবে তোমাদের কোন অস্তিত্বই থাকতো না।

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে, যদি প্রত্যেক পাপের শাস্তি দেয়া হোত তবে অনেক চতুস্পদ গবাদি পশুকে ধ্বংস করে দেয়া হোত। গবাদি পশুকে ধ্বংস করে দেয়া হলে মানুষও শেষ হয়ে যেত। কারণ মানুষের খাতিরেই তো এসব প্রাণীকে রক্ষা করা হয়ে থাকে।

সূরা নাহ্লের ১১১আয়াত থেকে জানা যায়। হিজরত তো আজকালও হচ্ছে। বাস্তবে আজও কিছু লোক বিপদগ্রস্থ হয়ে বাধ্য হয়ে হিজরত করছে। আর কিছু লোক বিপদগ্রস্থ বলে কাগজ-পত্র তৈরী করছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন, কার কী অবস্থা। কারো হিজরত তো জাগতিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য আর কারো হিজরত কোন মহিলাকে খুশী করার জন্য। অনেকে লিখে আমাদের হিজরত করিয়ে দেন আমার ছেলের সেখানে গিয়ে বিয়ে করাব। এ-ও কি হিজরত হয়? আল্লাহ্ সকলের হিজরত সম্পর্কে অবগত আছেন। যেমন এখানে বলা হয়েছে, 'আসল হিজরত তাদের যাদেরকে ফেৎনার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে'। এখানে ফেৎনা অর্থ ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হতে বাধ্য করা। অনেক সময় মানুষকে ধর্মত্যাগে বাধ্য করা হয়। কিন্তু সে আন্তরিকভাবে কখনও ধর্মত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় না। তাকে বড় কঠোর শাস্তি দেয়া হয় যেন বাধ্য হয়ে ধর্মত্যাগ করে। অতঃপর সে যদি হিজরত করে এবং ধর্মের জন্য সংগ্রাম করতে থাকে তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ অনেক বেশী ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "এমন লোক যারা সাধ্যাতীত যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নিজের ইসলামকে গোপন করে তাদের এ পাপ এক শর্তে ক্ষমার যোগ্য যে, তারা ঐ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েই হিজরত করবে, সুযোগ পেয়েই হিজরত করবে ...." (নূরুল কুরআন, পৃঃ ২৩)।

আপনারা জানেন, পাকিস্তানে অনেক আহমদীকে তাদের সাধ্যের বাইরে যন্ত্রণা ও কষ্ট দিয়ে জোরপূর্বক মুরতাদ করার চেষ্টা করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তো আহমদীরা যন্ত্রণা সহ্য করেও আহমদীয়তের উপর কায়েম থাকে। আল্লাহ্র বড়ই মহিমা যে আহমদীদেরকে তিনি এত বড় ধৈর্য ও সাহস দিয়েছেন! কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, কেউ কেউ সহ্য করতে না পেরে মৌখিকভাবে চাপের মুখে কিছু কথা তাদের মর্জি মত বলে ফেলে।

তারপর হযরত (আঃ) বলেছেন, ".....অর্থাৎ ধর্মের নামে জোরপূর্বক অত্যাচারে বাধ্য হয়ে কিছু কথা বলে ফেলে। কিন্তু পরে মুক্তি পেয়ে তারা ধর্মের খাতিরে বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করে, বড় বড় কঠিন অবস্থা ও কষ্টের মধ্যেও ধৈর্য ধারণ করে এসব কিছুর পর আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন। কারণ তিনি অনেক বেশি ক্ষমাশীল ও বড়ই দয়ালু।"

তারপর সূর নাহ্লের ১১৬ আয়াতে সমস্ত হারাম ও হালাল বস্তুর কথা জানা যায়। এখানে দেখুন, প্রাণ রক্ষার্থে কোন উপায়ান্তর না থাকলে অগত্যা শূকরের মাংস খাওয়া জায়েয করা হয়েছে। যদি তার অন্তরে এর প্রতি কোন আগ্রহ না থাকে, খেতে ভাল মনে হলেও কেবল প্রাণ রক্ষার্থে যৎ সামান্য খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনের চেয়ে যেন সামান্য ও বেশী খাবার আগ্রহ না করে। কিন্তু একটি হারামকে সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়েছে। ক্ষুধার অবস্থাতেও তা গ্রহণ করা জায়েয করা হয় নি, আর তা হচ্ছে সুদ। যদি কেউ সুদ খায় তার জন্য কোন অবস্থাতেই সুদ হালাল হবার কোন ফতোয়া কোথাও নেই। সকল অবস্থাতেই সুদ হারাম।

সুদ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন, দেখ, সুদ কত বড় ভয়ানক পাপ। তারা কি জানে না যে, শূকরের মাংস খাওয়া বিপজ্জনক অবস্থায় জায়েয করা হয়েছে যেমন বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অবাধ্য না হয় এবং সীমালঙ্ঘনকারীও না হয়, কিন্তু বিপদে পড়ে শূকরের মাংস খেতে বাধ্য হয় তবে আল্লাহ্ গফুরুর রহীম। তার পাপ ক্ষমা হবে। কিন্তু সুদ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন নি যে, বিপদে পড়ে বাধ্য হলে সুদ খাওয়া জায়েয হবে। বরং তার জন্য আদেশ করা হয়েছে, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক তবে সূদের যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা ছেড়ে দাও" (সূরা বাকারাঃ ২৭৯)। তোমরা সুদের টাকা দিয়ে রেখেছ, মনে রেখ যে, কোন অবস্থাতেই সুদের টাকা গ্রহণ করবে না। যা ইতঃপূর্বে করেছ তা করেছ। সে সব পাপ তো ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এরপর কোন অজুহাতেও সুদের টাকা খাবে না।

এর শাস্তি এত কঠোর যে, বলা হয়েছে "যদি তোমরা সুদ খাওয়া থেকে বিরত না হও তবে তোমরা শুনে রাখ যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে তোমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করা হোল। তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক" (সূরাতুল বাকারা ঃ ২৮০)।

এখানে আশ্চর্যজনক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় এই যে, এ যুগে যতসব বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তা সব সুদের ফলশ্রুতিতেই হয়েছে। সুদি ব্যবস্থাপনার ফলে এমন সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং সুদের উপরই যুদ্ধ চলে। নতুবা যুদ্ধ চলতো না। বড় বড় ধনবান রাষ্ট্রও বাধ্য হয়ে সুদের উপর টাকা সংগ্রহ করে যুদ্ধের খরচ চালিয়ে থাকে।

এখানে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এরই প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সুদের টাকা কোন অবস্থাতেই যেন খাওয়া না হয়। তোমরা সুদের কোন টাকা পাও তবে তা ইসলামে প্রচারে ব্যয় কর।

নিজেদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম বলে জেনে রাখ। এতদ্সঙ্গে হুযূর (আঃ) এ কথাও বলেছেন, 'আজ মুসলমানরা যদি ফেৎনা জর্জরিত হয়ে থাকে তবে তাদের নিজেদের অপকর্মের ফলে হয়েছে। হিন্দু যদি এ পাপ করে তবে সে ধনী হয়ে যায়।' অর্থাৎ মুসলমান সূদ খেলে ধনবান হবে না। তারা ভয়ানক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। হ্যাঁ, হিন্দুরা এ পাপ করে অর্থ উপার্জন করবে। এ জন্য যে, আল্লাহ্ তাদের ধরবেন না অধিকন্তু মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ শিক্ষা দিতে চান তারা ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

আমার কাছে অনেক আবেদন পত্র আসে। বলা হয় যে, "আমরা ঋণের মধ্যে ডুবে গেছি। খুব খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। এখন আমরা কারারুদ্ধ হব অথবা সন্তানরা না খেয়ে মরবে, ইত্যাদি।

,কেন এমন হয়েছে? সুদের বিনিময়ে টাকা *নিয়েছিলেন তারা।*

আমি সমস্ত জায়গায় ঘোষণা করিয়েছি, আমি বলেছি, যার প্রতি আল্লাহ্ করুণা করেন না আমি তার সাহায্য করতে পারি না। অন্য কারণে যদি বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ে কেউ তবে জামাত সাধ্যমত সাহায্য করবে। কিন্তু যারা সুদে টাকা নিয়েছে তাদের সাহায্য করা হবে না। এখানে এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে এ দেশে। আমি বার বার বলেছি যে, সবাইকে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে, বিভিন্ন মাধ্যমে ভাল করে বুঝিয়ে দিবেন যে, যারা সুদের টাকা নিয়েছে তাদের কোনভাবে সাহায্য করা হবে না।

সূরাতুন্ নাহলের ১২০ আয়াতে বলা হয়েছে তওবা করার সুযোগ তো ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ সে ধরা না পড়ে যায়। যদি পাকা চোরও কেউ হয় আর সে ধরা না পড়ে এবং পরে চুরি করা ছেড়ে দেয় তারপর পূর্বের চুরির কারণে তার হাত কাটা যাবে না। চুরি করে বেড়াচ্ছে এমন সময় ধরা পড়লে হাত কেটে দেয়ার প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু যদি চোর তওবা করে, চুরি করা ছেড়ে দিয়ে থাকে ও এভাবে দীর্ঘদিন চলে যায় তারপর পূর্বের চুরির দায়ে তার হাত কাটা যাবে না। চোরের তওবা যদি প্রকৃত তওবা বলে প্রমাণিত হয় তবে মু'মিনদের জামাতে তার হাত কাটা যাবে না।

বলা হয়েছে, মূর্খতাবশতঃ যদি কেউ পাপ করে বসে তারপর তওবা করে তবে তার তওবা গ্রহণযোগ্য । এর সাথে যদি নিজের সংশোধনও করে নেয় তবে আল্লাহ্ তার জন্য ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী। সূরাতু বনী ইসরাঈলের ৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে-

এখানে **গফুরুর রহীম** না বলে কেবল **'রহীম'** বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, "তিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌকা চালাবার ব্যবস্থা করেছেন, যেন এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্র ফযল চাও।"

এখানে প্রশ্ন এই যে, সমুদ্রে নৌকা চলাচলের ক্ষেত্রে বার বার করুণা প্রদর্শনের প্রসংঙ্গ আসছে কেন? বিষয় এই যে, সমুদ্রের বায়ু প্রবাহ্ পরিবর্তন হতে থাকে, প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা ইত্যাদি এসে পড়ে। বার বার মাঝি মাল্লারা বিপদে পড়ে। জেলেরা অনেক সময় প্রচুর মাছ ধরে ফেলে, আর কোন সময় মাছ ধরা পড়েই না। পরিশ্রম বৃথা যায়। সকলকে এর মাধ্যমে আল্লাহ্র স্মরণ করাতে থাকেন যে, কোন দিন বড় সুবিধাজনক হয় আর কোন কোন দিন বড় বিপজ্জনক হয়। স্মরণ রাখ যে, আল্লাহ্ রহীম, তিনি তোমাদের বার বার সুযোগ দিতে থাকবেন। তোমাদের সম্পূর্ণ ব্যর্থ করবেন না।

সূরাতুল হাজ্জ ৬৬ তে বলা হয়েছে, তিনি আকাশকে ধরে রেখেছেন যেন সেটি পৃথিবীর উপর এসে না পড়ে যায়। এর অর্থ কী?

অর্থ এই যে, আকাশ থেকে ছোট বড় বহু উল্কাপিন্ড এসে পৃথিবীর উপরে পড়ে যেতে চায়। কিন্তু মানুষ জানে না যে, এ সমস্ত উল্কা পিন্ডের বেশীর ভাগই মাঝপথে জ্বলে ছাই হয়ে যায়। নতুবা বড় বড় উল্কাপিন্ড যদি পৃথিবীতে এসে পড়ে যেত তবে মানুষের এখানে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ত। কিন্তু আল্লাহ্তাআলা ওসব উল্কাপিন্ডকে এখানে এসে ধ্বংসলীলা চালাবার সুযোগ দেন না। কিছু কিছু আল্লাহ্র আদেশে পৃথিবীতে এসে পড়ে। কিন্তু অধিকাংশ উল্কাপিন্ড পৃথিবীতে এসে পড়ে না।

অনেক সময় বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এবার একটি উল্কাপিন্ড ভূপৃষ্ঠে এসে পড়তে যাচ্ছে। এটা পৃথিবীতে আঘাত হানবে। কিন্তু দেখা যায় যে, ঐ উল্কাপিন্ডটি পৃথিবীর পাশদিয়ে কোটি মাইল দূর দিয়ে অন্যদিকে চলে গেছে। যতদিন আল্লাহ্ চান ততদিন এমন হতে থাকবে। **ইল্লা বিইযনিল্লাহ্** আল্লাহ্র আদেশেই এমন হতে থাকবে। আল্লাহ্ নিশ্চয় মানুষের প্রতি বড় দয়ালু। এখানে পাপী বা পুণ্যবানের মধ্যে পার্থক্য রাখা হয় নি। সকল মানুষের জন্য আল্লাহ্ বড় দয়াময় ও মমতাময়। যদি আল্লাহ্ দয়াময় না হতেন তবে তো কেবল আকাশ থেকে এমন সব উল্কাপিন্ড এসে পৃথিবীতে পড়ত যদ্বারা মানব জাতি ধ্বংস হয়ে যেত (সূরাতুন্ নূরঃ ৫-৬)

বলা হয়েছে আশিটি বেত্রাঘাত সম্পর্কে কতিপয় ফিকাহ্বিদ্ ফতোয়া দিয়েছেন যে, বিবাহিতা স্ত্রীলোক যদি অপরাধী হয় হবে প্রস্তারাঘাত করা হবে। ('রজম' মানে পাথরের আঘাত) আর যদি অবিবাহিতা কুমারী নারী অপরাধী হয় তবে বেত্রাঘাত করা হবে। এ ধরনের ফতোয়া কুরআন ও সুন্নাহ্ সমর্থন করে না। আলোচ্য আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, বিবাহিতা অবিবাহিতা কোন বিভেদ নেই, আর রজ্ম বা প্রস্তরাঘাতের বিধানও নেই।

এখানে কোন্ লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে? যারা অন্যায় অপবাদ আরোপ করেছে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যারা অপবাদ দিয়েছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অন্যায় অপবাদ আরোপ করা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ এবং অনেক বড় ঘটনা ছিল।

কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, কোন পবিত্র চরিত্রের সতী নারীর উপর অন্যায় অপবাদ দেয়া অনেক বড় অপরাধ। কিন্তু এদেরও তওবা কবুল হতে পারে যদি তারা তওবা করে এবং তওবার পরে সংশোধন করে করে নিজেদের, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই অতীব ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

সূরাতুন্ নূর ঃ ২০ আয়াতে বলা হয়েছে, "যারা চায় যে, মু'মিনদের সমাজে অশ্লীলতা বিস্তার ঘটুক তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব আছে।"

এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, এ ধরনের অপকর্মে যারা লিপ্ত থাকে তারা চায় যে, তাদের সহকারী ও সহযোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক। অশ্লীলতা এমন অপরাধ যে, দ্রুত বিস্তার লাভ করে। অনেকে একে আধ্যাত্মিক মহামারীও বলেছে, যা দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং এ ধরনের হতভাগ্যদের পরিধি দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। এদের জন্য বলা হয়েছে যে, এদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব নির্ধারিত আছে-ইহকালে এবং পরকালে। এ আযাব আল্লাহ্ দিবেন যিনি জানেন যে, কে এ অপরাধে অপরাধী মানুষ তো খুব অল্পই জানতে পারে যে, কে এমন অপরাধী। পরের আয়াতে বলা হয়েছে (সূরাতুন্ নূর আয়াত ২১)

"যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ না হোত তার দয়া না হোত তবে তো তোমরা বড় সংকটে পড়ে যেতে। কিন্তু আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়, বার বার কৃপাকারী।

অর্থাৎ আল্লাহ্র রহমত না হোত তবে তোমরা উক্ত অপরাধে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে। এটি এমন একটি অপরাধ যে, এখানে তো কোন করুণা বা কৃপা প্রদর্শনের আশা করা যায় না। অর্থ এই যে,আল্লাহ্র রহমত তাদের উপর বর্ষিত হয়। যারা অপরাধী নয়। অপরাধীরাতো ধ্বংস হবেই। কিন্তু যারা অপরাধে লিপ্ত হয় না তাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত হয়। তারা এর থেকে বেঁচে যায়। এখানে **রউফুর রহীম** অর্থ এই যে, এরা এহেন পাপ থেকে দূরে থাকতে এবং রক্ষা পেতে সক্ষম হবে।

অনুবাদ- মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আধ্যাত্মিক জগতের মণি-মুক্তা
দোয়ার বরকতে হত্যা মামলায় মুক্তি লাভ

জোড়া কাসুরি-এর অধিবাসী হযরত মৌলবী নিযামউদ্দীন সাহেব ইংল্যান্ডের মুবাল্লিগ হযরত চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সায়াল সাহেবের শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একজন বুযূর্গ সাহাবী ছিলেন। বয়াতকারীগণের তালিকায় ১৯০০ সনের ৩১ মার্চ আল্ হাকাম পত্রিকার ৭ পৃষ্ঠার ২য় কলামে তাঁর নাম সংযুক্ত আছে।

তিনি লিখেছেন-

"আমি যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করি, তখন আমার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা ছিল এবং সেই মোকদ্দমা সেশন কোর্টে সোপর্দ করা হয়। আমি দোয়ার জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়ালের সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদের নিকট যাই। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমার জন্য দোয়া করেন। তৃতীয় দিন আবার খলীফাতুল মসীহ আওওয়ালের সাথে অনুমতি লওয়ার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদের কাছে যাই এবং বলি যে, "আমি চাচ্ছি, হুযূর আমার জন্য দোয়া করবেন"। তিনি বললেন, **যান, আপনার জন্য আমি বহু দোয়া করেছি। আপনি ইনশাআল্লাহ্তাআলা অবশ্য খালাস পেয়ে যাবেন। তিনি আরো বললেন, মোকদ্দমার ব্যাপারে আপনি অবশ্য চেষ্টা করবেন।** আমি বললাম, আমি কি চেষ্টা করব, কি চেষ্টাই বা আমি করতে পারি ? আপনি দোয়া করুন।

তখন তিনি এই কথাগুলো উচ্চারণ করে বললেন, 'আপনি দোয়া করুন, চেষ্টাও এক প্রকার দোয়া।' তারপর কাদিয়ান থেকে নিজ গ্রাম জোড়ায় আসি এবং লোকজনকে একথা জানাই। ...

আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দোয়া করেছেন এজন্য আমি মুক্তি পেয়ে যাব। কিন্তু সাথে সাথে মামলার অবস্থা ভেবে মনে অনেক ভয় এবং আশংকাও সৃষ্টি হচ্ছিল। কেননা, সাক্ষীরা সকলেই সাক্ষ্য দিয়েছে যে, চৌধুরী নিযামউদ্দিনই হত্যা করেছে। আর এর ফলেই মানুষ উত্তেজিত হচ্ছিলো এবং আসল কারণ এটাই ছিল।

(কেননা এসব কিছুই সম্পূর্ণ ভুল ছিল। তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না।)

এমন কি বি.জি অথ্রিজ ব্যারিস্টার বলতেন, "আপনি কোনভাবেই বাঁচতে পারবেন না, অন্যদের মধ্যে হয়ত কেউ বাঁচলে বেঁচেও যেতে পারে"। এই স্বপ্ন আমি সকল ওহাবীদেরকে জানিয়ে দিয়েছি। এতে আমার এক ফুফাত ভাই চৌধুরী মিশ্রী বললেন, মামলা চলে গেছে সেশনে আর তুমি বলছ বেঁচে যাবে। আমি বললাম, খোদা আমাকে বলছেন, তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে। তার কথা ভুল হয় না, সে কারণেই আমি মুক্তি পেয়ে যাব। সুতরাং সেশন জজ আমাকে মুক্ত করে দেন।

বাকী সাতজন যাদের নামে মোকদ্দমা ছিল, তারা আটক হয়ে থাকল। এর পরে অভিযুক্তরা হাইকোর্টে আপিল করে। বেঞ্চের সামনে মোকদ্দমা পেশ করা হয়।

ক্লার্ক নামে একজন জজও সেই বেঞ্চে ছিলেন, যিনি আমার পিতা চৌধুরী গরীব জলদার সাহেবকে ভালভাবে জানতেন। আইনজীবীগণ তাঁর সামনে বিতর্ক শুরু করেন এবং এ বিষয়ের উপর জোর দেন যে, যার ভিত্তিতে চৌধুরী নিযামউদ্দীন সাহেবকে মুক্তিদান করা হয়েছে, এতে মনে হয় যে, বিবাদীর (আসামীর) সাক্ষ্য সত্য এবং বাদীর সাক্ষ্য মিথ্যা। সুতরাং অভিযুক্তদেরকেও মুক্তি দেয়া হোক।

এরই প্রেক্ষিতে জজ সাহেব বললেন, আমি সাত বছর লাহোর জেলার ডেপুটি কমিশনার ছিলাম এবং চৌধুরী গরীব জেলদারের বংশ পরিচয় খুব ভালভাবে জানি। বাদীর সাক্ষ্য সব সত্য এবং বিবাদীগণের সব সাক্ষ্য মিথ্যা। যেহেতু অভিযুক্তদের প্রায় সমস্ত পরিবার কারারুদ্ধ হয়ে গেছে, সে জন্য বুটারাম সেশন জজ কেবল দয়ার্দ্র হয়ে চৌধুরী সাহেবকে মুক্ত করে দিয়েছেন। যাতে এই পরিবার নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায়। তা না হলে তার মুক্তি পাবার কোন কারণ নেই। আর আমি এখনো তাকে গ্রেফতার করতে পারি। তবে আমিও তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করছি।

অতএব ঐ আপীল খারিজ হয়ে যায় এবং তাদের সাজা বহাল থেকে যায়। আর খোদাতাআলা আমাকে মুক্তি দান করেন। (আল্ হাকাম, ২১ জুলাই, ১৯৩৪ সন পৃঃ ৫-৬)।

মুর্শেদে রব্বানীর সুদৃষ্টির প্রভাব

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব লিখছেন,

"আমার বয়াতের প্রারম্ভিক বছরগুলোতে একজন সূফী (সাধক) প্রকৃতির ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি অধিকাংশ সময় সূফীদের সাহচর্য লাভ করতেন। একথা জানতে পেরে আমি হযরত মির্যা সাহেবের হাতে বয়াত গ্রহণ করি। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলেন, "আপনি খুব শীঘ্র ইসলামের বিরোধী খৃষ্টান আর্য জাতিগুলোর মোকাবেলার জন্য এক বিশেষ শক্তি অর্জন করবেন। আমি বললাম, আপনি তা কেমন করে জানলেন। জবাবে তিনি বললেন, আপনি যাঁর হাতে বয়াত করেছেন তাঁর বিশেষ মনোযোগ মিথ্যা ধর্মগুলোকে নির্মূল করার দিকে অনেক অগ্রসর। আর মুর্শেদের সুদৃষ্টি তাঁর মুরিদানের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সুতরাং আমি আমাদের জামাতের সদস্যদের মধ্যে বহুল পরিমাণে এর প্রভাব প্রত্যক্ষ করছি।

প্রত্যেক ক্ষেত্রে অপরাপর ধর্মের লোকদের উপর আহমদীদের অধিক প্রভাব রয়েছে, সে একজন অতি সাধারণ যোগ্যতার আহমদীই হোক না কেন ? (বদর, কাদিয়ান ১১ ডিসেম্বর, ১৯১৩ পৃঃ ৫)

ভাষান্তর ঃ **শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ**
(দৈনিক আল্ ফযলের সৌজন্যে)

"আমি তাহা (অর্থাৎ আদম) অপেক্ষা উত্তম তুমি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছ আর তাকে নিকৃষ্ট কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করেছ (সূরা আরা'ফ)। পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তাআলা ইবলীস ও শয়তানের কাহিনী কেবল গল্পচ্ছলে কেচ্ছা-কাহিনী রূপে পাঠ করার জন্যই বর্ণনা করেন নি, বরং অহংকারবশতঃ আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত নবী হযরত আদম (আঃ)-কে অমান্য ও অস্বীকার করার কারণে পরিণামে ইবলীসের কি দশা হয়েছিল, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যেই পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মানুষ যখন অধর্মের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পার্থিব গৌরবের উচ্চাসন লাভের মোহ-মায়ায় হিংসা বিদ্বেষ, ঝগড়া কলহ, মারামারি স্বার্থের হানাহানি, ধর্মের নামে দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, অবিচার, নির্বিচারে যুলুম নির্যাতনে লিপ্ত এবং স্বার্থান্ধ ও সংকীর্ণমনা সমাজ পতিগণ ধর্মীয় আবরণে সাধু সেজে মানবতা বিরোধী কার্য- কলাপকে ধর্মীয় কাজ বলে বিশ্লেষিত করতঃ শান্তি প্রেম ও পবিত্রতার পরিবর্তে শয়তানি তান্ডব লীলা মেলায় মেতে ধরণীর আবহাওয়াকে করে তুলে বিষাক্ত, এরূপ অবস্থা দয়াময় আল্লাহ্‌তাআলা বান্দার প্রতি করুণার নিদর্শনরূপে মানুষেরই কল্যাণের নিমিত্তে মানুষেরই মধ্য থেকে কোন একজন প্রেরিত মহাপুরুষকে আবির্ভূত করেন, যিনি এসে অধর্মের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত মানব জাতিকে উদ্ধার করতঃ মানবতার উচ্চাসনে উন্নীত করেন। ইহাই আল্লাহ্‌তাআলার চিরন্তন বিধান। পাক কালামে আল্লাহ্‌তাআলা হযরত রসূল করীম (সঃ)-কে বলেন, "তোমার পূর্বে আমি অসংখ্য নবী প্রেরণ করেছি, তন্মধ্যে কোন কোন নবীদের নাম তোমার নিকট উল্লেখ করেছি এবং তন্মধ্যে তোমার নিকট কোন কোন নবীর নাম উল্লেখ করি নি" (সূরা মু'মিন) "নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির ভিতর এক একজন নবী প্রেরণ করেছি" (সুরাতুন্ নাহল)। "প্রত্যেক জাতির এক একজন পথ প্রদর্শক ছিলেন" (সুরাতুর রা'দ)। "প্রত্যেক জাতির জন্য এক একজন রসূল ছিলেন" (সূরাতু ইউনুস)।

নবী-রসূল প্রেরণ বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌তাআলার একটি বিশেষ রহমত।

অহংকারের পরিণাম

হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যত নবী-রসূলের আগমন হয়েছে মানুষের মঙ্গল ব্যতীত কেউই অমঙ্গল করেন নি। কিন্তু মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। যখনই কোন নবী-রসূলের আবির্ভাব হয়েছে তখনই তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে কোমর বেঁধে লেগেছে, বিশেষ করে সমসাময়িক আলেম উলামাগণ। তাই পাক কালামে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "হায়! বড়ই আফসোস বান্দাগণের জন্য এমন কোন রসূলের আগমন হয় নি, যাঁকে নিয়ে তারা হাসি-ঠাট্টা ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ না করেছে" (সূরাতু ইয়াসীন)। অহংকার প্রকাশ করতঃ আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রসূলের প্রতি অবজ্ঞা ও তাঁদেরকে অস্বীকার করার অর্থ বুঝতে হবে আল্লাহ্‌তাআলার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হওয়া। গর্ব ও অহংকারবশতঃ হযরত আদম (আঃ)-কে অমান্য ও অস্বীকার করার কারণেই পরিণামে ইবলীস হয় চিরতরে অভিশপ্ত। পুঁথিগত বিদ্যা এবং প্রভাব প্রতিপত্তির গর্ব অহংকারেই আবুল হাকাম, অর্থাৎ জ্ঞানীর পিতা হয় আবূজাহল নামে অভিশপ্ত। বর্তমান আখেরী জামানার এক প্রান্তে বসে আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তারই পুনরাবৃত্তির একই দৃশ্য অবলোকন করছি।

সর্ব যুগেই ধর্ম রক্ষার কর্তা সেজে আলেম উলেমা ও পীর পৌরহিতগণ অহংকারের বশবর্তী হয়ে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং সহজে বিনা পরিশ্রমে ধর্মীয় ব্যবসার আয় রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেখে সংসারাসক্তির কারণে ঈর্ষার অনলে গাত্রগাহ শুরু হয়েছে এবং ধর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে নানান প্রকার মিথ্যা বানোয়াট কথা দ্বারা সাধারণ মানুষকে সত্য সেবকগণের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। একটা সত্যকে ঢাকার জন্য হাজারো মিথ্যা কথার আশ্রয় নিয়েছে। বর্তমান যুগ সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, সাধারণ মানুষ যখন কোন বিষয় জানার জন্য আলেম উলামাগণের নিকট যাবে, তখন তাদেরকে দেখতে পাবে কেউবা কুকুর, কেউবা শূকর, কেউবা ভারবাহী গাধা ইত্যাদি। কুকুর, শূকর ইত্যাদি চতুস্পদ জন্তুদেরকে তাদের আকৃতির জন্য কেউ ঘৃণা করে না। ঘৃণা করে তাদের স্বভাবের জন্য।

সৎ ও অসৎ মানব হৃদয়ের এক একটি গুণ বা অবস্থা। অহংকার একটি অতি জঘন্য অবস্থা। পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তাআলা বহু স্থানে অহংকারী ব্যক্তির নিন্দা করেছেন। "এই প্রকারে আল্লাহ্‌তাআলা প্রত্যেকটি অহংকারী ও গর্বিত লোকের অন্তরে মোহর লাগিয়ে থাকেন" (সূরতুল মু'মিন)। "নিশ্চয়ই আমি আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি বিচারের দিনের প্রতি অবিশ্বাসকারী প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তি হইতে।" "প্রত্যেক অহংকারী অবাধ্য লোক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।" হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না" "দোযখের মধ্যে হাবহাব নামে একটি জঘন্য কুপ আছে, অবাধ্য ও অহংকারী লোকদেরকে সেই কুপে নিক্ষেপ করা হবে।" তিনি আরো বলেছেন, "অহংকারী লোকদেরকে কিয়ামতের দিন পিপীলিকার আকারে আল্লাহ্‌তাআলার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ্‌তাআলার সম্মুখে তারা অন্যান্য লোকের পদতলে নিষ্পেষিত হয়ে বড় হীন ও অপদস্থ হতে থাকবে।" পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহতাআলা ইবলীস, নমরূদ, ফেরাউন, প্রভৃতির অহংকারের পরিণাম সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতঃ মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছেন গর্ব ও অহংকারবশতঃ আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত নবী-রসূলকে অমান্য ও অস্বীকার করা অতি ক্ষতিকর ও জঘন্যতম অপরাধ। মক্কার কাফিররা হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর প্রতি অহংকার করে বলেছিল, আমাদের মধ্য হতে একজন জ্ঞানী-গুণী প্রতিপত্তি ও প্রভাবশালী লোককে কেন রসূল করলেন না? একজন নিরক্ষর নিঃসহায় নিঃসম্বল অনাথ লোককে রসূল করে পাঠালেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "এবং তাহারা বলিল, এই কুরআন (মক্কা ও তায়েফ) এই দুই শহরের কোন একজন শ্রেষ্ঠ লোকের উপর কেন নাযিল করা হইল না" (সূরাতুয্ যুখরুফ)। তাদের অহংকার এতই প্রবল ছিল যে, সেই অহংকারে তাদের বিবেক-বিবেচনা বোধশক্তিকে সমাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাদের এই অহংকার সম্পর্কে

আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "যাহারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করিয়া বেড়ায় আমি তাহাদিগকে আমার নিদর্শনগুলি হৃদয়ঙ্গম করার প্রতি পথ দেখাই না"। অহংকারী ব্যক্তি নিজে আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত মহাপুরুষের শাশ্বত সত্য কথা মেনে নেয় না এবং অন্যকেও মেনে নিতে নিষেধ করে থাকে। হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন,

"নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে ধারণা করাই বিদ্যার জন্য এক মহা বিপদ।" পুঁথিগত ফতুয়া সম্বন্ধীয় বিদ্যা অর্থাৎ ফেকাহ শাস্ত্রের মধ্যে ডুবে থাকলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে মানব হৃদয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে এবং আত্মম্ভরিতা গর্ব ও অহংকার বৃদ্ধি পায়। আধ্যাত্মিক জ্ঞান শূন্য ফতুয়াবাজিতে পারদর্শী আলেম উলামাগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই বর্তমানে তাদের অবস্থা হাল হকীকত কীরূপ তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। অশেষ পুণ্যের নামে দু'জাহানের অশেষ সওয়াব হাসিলের নামে পেশাদার অনর্গল ভাষী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তৃতায় বুলবুল উপাধি প্রাপ্ত আলেম উলামাগণ মিলাদে নিজেদের পসন্দমত বেছে বেছে অন্তঃসারশূন্য অথচ সুশ্রাব্য মন মাতানো ছন্দে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। তা শ্রবণে শ্রোতাবৃন্দ মোহিত হয়ে মুহুর্মুহু তকবীর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলে। এই সকল বক্তাগণের উদ্দেশ্য খোদা-ভীতি ও পারলৌকিক কল্যাণ অর্জন নয়; বরং সস্তা বাহবা অর্জন করা। আবার দেখা যায় অহংকারবশতঃ অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা বানোয়াট বাক্য দ্বারা সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। জনসাধারণ এগুলিকে ধর্মীয় উপদেশ বলেই মনে করে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে এই সমস্ত বাক্য সাধারণ মানুষের অন্তরে অহংকার, হিংসা-দ্বেষ ও শত্রুতার বীজ বপন করে থাকে। আলেম উলামাগণ বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে মিষ্টি মধুর স্বরে ছন্দমুক্ত পরিপাটি হেয়ালিপূর্ণ আজগুবি কেচ্ছা-কাহিনী দ্বারা ভ্রান্ত উপদেশ দানে সাধারণ মানুষকে অজ্ঞানতার তিমিরে ঠেলে দিয়ে নিজেরা বাহাদুরী প্রকাশ করে থাকেন। যার মোহে সাধারণ মানুষ অচেতন অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়, কেননা সাধারণ মানুষ অতসব বুঝে না। আলেম-উলামাগণ যা বলেন, তাই তারা সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে থাকে। সুতরাং তাদের এ মোহ নিদ্রা ভাংবে কারা? নায়েবে রসূলের দাবীদারগণ তো নিজেরাই মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "তুমি বল, আমি তোমাদেরকে সে সমস্ত লোকের বিষয় সংবাদ দিব, যারা আমল ও অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্থ ? যাদের পার্থিব জীবনের সমস্ত চেষ্টাই বৃথায় পর্যবসিত হয়েছে অথচ তারা ধারণা করে যে, তারা উত্তম কার্যই করছে" (সূরাতুল কাহ্‌ফ)

"মানুষের বিনাশ হউক, সে কেমন অকৃতজ্ঞ (অর্থাৎ অহংকারী) কি পদার্থ দ্বারা আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন (তাহা জান কি?) আল্লাহ্ উহাকে এক বিন্দু শুক্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অনন্তর তাহার সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তাহার গতি পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন। পরিশেষে তাহাকে মৃতদেহে পরিণত করিয়া কবরে স্থাপন করিবেন। অনন্তর যখন ইচ্ছা তাহাকে পুনরুত্থিত করিবেন" (সূরা আবাসা)।

"মানুষের উপর কি এমন সময় আসে নাই যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না" (সূরাতুত্ দাহর)। অর্থাৎ মানুষকে নিজের পরিচয় সম্পর্কে একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখা উচিত যে, এই পৃথিবীতে তার কোন নাম গন্ধই ছিল না। স্বয়ং আল্লাহ্‌তাআলা এক বিন্দু অপবিত্র শুক্র দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তার না ছিল শ্রবণ-শক্তি, না ছিল দর্শন-শক্তি, না ছিল কথা বলার ক্ষমতা। এক বিন্দু তরল পদার্থ থেকে রক্ত বিন্দু অতঃপর মাংসপিন্ড। এমনিভাবে আল্লাহ্‌তাআলা সুকৌশলে হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন করেছেন। অপরের খোঁজ-খবর নেওয়া দূরে থাক, নিজেরই কোন খবর ছিল না। আল্লাহ্‌তাআলা তাকে বাক্ শক্তি দিয়েছেন, শ্রবণ-শক্তি দিয়েছেন, দর্শন-শক্তি দিয়েছেন, বুদ্ধি-বিবেচনা-শক্তি দিয়েছেন। যুগে যুগে নবী রসূল প্রেরণ করতঃ তাঁদের মাধ্যমে সত্য, সরল ও সঠিক পথে চলতে শিক্ষা দিয়েছেন। তবে কিসের জন্য সে বিদ্যা-বুদ্ধিও ক্ষমতার অহংকার করবে? মানুষ তার নিজের ক্ষমতা বলে পৃথিবীতে আগমন করে নি। না তার কোন ক্ষমতা বলে চিরকাল এই পৃথিবীতে অবস্থান করতে পারবে। এ নিদিষ্ট কাল অতিবাহিত হওয়ার পর এক মুহূর্তও এখানে টিকিবার ক্ষমতা নেই। এমতবস্থায় সে গর্ব অহংকার করবে কোন্ ক্ষমতা বলে?

"কখনই নহে, বরং নিজ কর্মের ফলে উহাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে" (সূরা তাৎফীফ)। হিংসা গর্ব অহংকার যখন স্বভাবগত হয়ে যায় তখন তাদের সংশোধনের আর কোন উপায় থাকে না যদি না মহান আল্লাহ্‌তাআলার তরফ থেকে আসমানী রহমত তাদের উপর বর্ষিত হয়। তাহলেই তারা সেই জঘন্যতম স্বভাব পরিহারপূর্বক সত্যকে চিনে সৎ পথ অবলম্বন করতে পারে। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "তাদের হৃদয় পীড়াগ্রস্ত হয়েছে।"

শরীর অসুস্থ হলে যেমন সুখাদ্যে অরুচি জন্মে এবং অনিষ্টকর কুপথ্য ভোজনের প্রবৃত্তি হয়, তদ্রূপ হৃদয় পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সৎচিন্তায় বিমুখ হয়ে মিথ্যা ও অসৎ চিন্তা ভাবনায় লালায়িত হয়ে পড়ে। শারিরীক পীড়াগ্রস্ত ব্যাক্তির যেমন ইহ জগতে ধ্বংস ও বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে তদ্রূপ হৃদয় পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণের দুর্গতি ও বিনাশ প্রাপ্তির অবশ্য আশঙ্কা রয়েছে।

- সরফরাজ এম,এ সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

পাক্ষিক আহমদী'র সম্মানিত পাঠকদের প্রতি

পাক্ষিক আহমদী পত্রিকা প্রকাশনার ৬৩ বর্ষ অতিক্রম করে ৬৪ বর্ষের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হ'ল। আল্ হামদুলিল্লাহ্।

সম্মানিত পাঠক ও গ্রাহকদেরকে অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমান বছরের গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক টাকা ১৫০/= (একশত পঞ্চাশ) এবং যাদের বিগত বছরের গ্রাহক চাঁদা বকেয়া রয়েছে সেই বকেয়াসহ শীঘ্র পরিশোধ করবেন। উক্ত চাঁদার টাকা 'আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ' বরাবরে ডি.ডি. অথবা মনি-অর্ডার যোগে নিম্ন ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

গিয়াসুদ্দীন আহমদ
হিসাব ব্যবস্থাপক
পাক্ষিক আহমদী
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্নকর্তা - জনাব আব্দুল আলীম, কুড়িগ্রাম

প্রশ্ন ঃ আহমদী জামাত-এর প্রতিষ্ঠা কেন হয়েছে? কে প্রতিষ্ঠা করেছেন, এর উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ এ প্রশ্নের উত্তর অনেক ব্যাপক, তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ইসলামের বিশ্ববিজয়ের লক্ষ্যে আল্লাহ্ কর্তৃক এ জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর মাধ্যমে। তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আঃ)।এ জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জামাত প্রতিষ্ঠাতার বক্তব্য শুনুন ঃ

"আজ সেই দিন আগত প্রায় যখন সত্যের দেদীপ্যমান সূর্য পশ্চিম হইতে উদিত হইবে এবং ইউরোপবাসী সত্য খোদার সন্ধান লাভ করিবে। ... সেই দিন নিকটবর্তী যখন ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্ম লোপ পাইবে এবং সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে কিন্তু ইসলামের ঐশী অস্ত্র ততদিন পর্যন্ত না ভগ্ন হইবে, না তীক্ষ্ণতা হারাইবে, যতদিন পর্যন্ত না উহা দাজ্জালী শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া খোদাতা'আলার সেই খাঁটি তৌহীদ যাহা মরুপ্রান্তরের অধিবাসীগণ এবং যাহারা সর্বপ্রকার জ্ঞানালোক হইতে বঞ্চিত তাহারাও নিজ অন্তরে উপলব্ধি করিবে এবং অচিরেই তাহা সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। সে দিন না কোন কল্পিত প্রায়শ্চিত্তের অস্তিত্ব থাকিবে, না কোন কল্পিত খোদার। আল্লাহ্তাআলার একটি আঘাত কুফরীর যাবতীয় প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে। কিন্তু তাহা কোন তরবারীর সাহায্যে বা কোন বন্দুকের দ্বারা হইবে না বরং উহা সত্যানুসন্ধিৎসু আত্মাকে আলোক দানের মাধ্যমে হইবে। আমি যাহা বলিতেছি, তখন তোমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে" (তাযকিরা, ২৯৯ পৃঃ)।

প্রশ্ন ঃ আঁ হযরত (সঃ) কথাটির অর্থ কি?

উত্তর ঃ 'আঁ' শব্দটি ফার্সী। অর্থ সেই। এতদ্দ্বারা 'সেই হযরতকে' বুঝায় যার সম্বন্ধে তওরাতে ও বাইবেলে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর আগমন সম্বন্ধে তওরাতে ও বাইবেলে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ১৫-১৯ ও যোহন-১৪ঃ১৬-২৭)

প্রশ্ন ঃ সালানা জলসা কি, কেন কোথায় হয়?

উত্তর ঃ সালানা জলসা বলতে বুঝায় বাৎসরিক সমাবেশ বা মাহফিল। আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কাদিয়ানে প্রথম সালানা জলসার প্রবর্তন করেন। এখন ইহা সারা আহমদী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এ জলসার সময় আহমদীয়ার আধ্যাত্মিক পরিবেশে একত্র হয়ে প্রেম-প্রীতি পরিবেশে ভ্রাতৃ-সম্মেলন এবং দোয়া-ইস্তিগফার নফল ইবাদত প্রভৃতির সাথে সাথে যুগ-খলীফা ও বুযূর্গদের ঈমানবর্ধক বক্তৃতাদি শুনে তাদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবৃত্ত করে। যারা নতুন তাদের সাথে পরিচয় হয় ও যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। এতে আহমদীয়ত সম্বন্ধে জানার ও বুঝার জন্যে নতুন নতুন বন্ধুদেরও আগমন হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ঃ (রাহেঃ) (আইঃ) এসব কথার অর্থ কী?

উত্তর ঃ '(রাহেঃ)' দ্বারা **রাহেমাল্লাহুতাআলা** এবং (আইঃ) দ্বারা **আইয়্যাদাহুল্লাহুতাআলা বিনাসরিহিল আযীয** বুঝানো হয়ে থাকে। আহমদী জামাতের তৃতীয় খলীফা ও চতুর্থ খলীফার জন্যে যথাক্রমে ইহা বলে দোয়া করা হয়ে থাকে। **রাহেমাল্লাহুতাআলা** অর্থ আল্লাহ্তাআলা তাঁর ওপরে অনুগ্রহ করুন। আর **আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আযীয** অর্থ ঃ আল্লাহ্তাআলার শক্তিশালী সাহায্যকারী হাত তাঁর সাথে থাকুক।

প্রশ্ন ঃ ওয়াকফে নও কি ?

উত্তর ঃ আহমদী জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর একটি ঐতিহাসিক তাহরীক বা ঘোষণা যার অর্থ **নব উৎসর্গ**। ১৯৮৭ সনের এপ্রিল মাসে জামাতের ভবিষ্যত মুরব্বী মোবাল্লেগের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে জামাতের সন্তানসম্ভবা সদস্য-সদস্যাগণকে তাদের ভাবী সন্তানকে আল্লাহ্র পথে স্বেচ্ছায় কুরবানী বা উৎসর্গ করার জন্যে তাঁর নিকট আবেদন করার জন্যে বলেন। প্রথম তিনি ৫,০০০ সন্তান চান। বর্তমান জামাত ২০ হাজারেরও অধিক ছেলে-মেয়ে এ স্কীমের অধীন উৎসর্গ করেছে। এ স্কীমের সফলতাও আহমদী জামাতের সত্যতার একটি নিদর্শন।

প্রশ্ন ঃ পাক্ষিক আহমদী পত্রিকা কি নিয়মিত পেতে পারি ?

উত্তর ঃ বাৎসরিক ১৫০/- টাকা চাঁদা দিলে পেতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ MTA ও MTV কি? MTA -এর সংযোগ নিতে হবে কিভাবে?

উত্তর ঃ MTA দ্বারা আহমদী জামাত কর্তৃক প্রচারিত সারা বিশ্বে অহোরাত্র প্রচারিত টি,ভি নেট ওয়ার্ক **মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনালকে** বুঝায়। এ চ্যানেলে বিভিন্ন ভাষায় শুধু মাত্র ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়ে থাকে।

টি, ভি সংযোগের জন্যে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের MTA বাংলা বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার প্রশ্নের জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

- নির্বাহী সম্পাদক

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাস্হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত

নেসাবে ওয়াক্‌ফে নও

(১৪ থেকে ১৫ বছরের বালক-বালিকাদের জন্য পাঠ্য-সূচী)

(৩য় কিস্তি)

দ্বিতীয় ৬ মাস

কুরআন করীমের ৩য় ও চতুর্থ পারা অনুবাদ সহ পাঠ করা শেষ করুন।

❑ কুরআনের অংশ বিশেষ তরজমাসহ মুখস্ত করুন। সূরাতুন্ নাসর, সূরাতুল কাফিরূন, সূরাতুল মা'উন, সূরাতু বানী ইসরাঈল ৭৯ থেকে ৮৫ আয়াত এবং হামিম আস্ সাজদাহ্ ৩১ থেকে ৩৬ আয়াত।

❑ হাদীস অনুবাদসহ

● **আল্ জান্নাতু তাহ্‌তা আকদামিল উম্মাহাতি**-অর্থাৎ জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে।

● **কুল বিইয়ামীনিকা ওয়া মিম্মা ইয়ালীকা** অর্থাৎ ডান হাতে খাও এবং সম্মুখ থেকে খাও।

● **লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা ক্বাতি'উন** অর্থাৎ সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

❑ নযমগুলো মুখস্ত করুন ঃ (...পৃষ্ঠা দেখুন)

উওহ পেশওয়া হামারা জিস সে হ্যা নূর সারা
নাম উসকা হ্যা মুহাম্মদ দিল বর মেরা এহি হ্যা ॥ (দুররে সামীন, পরবর্তী ১০টি পংক্তি)

মুহাম্মদ পার হামারি জাঁ ফিদা হ্যা
কে উওহ্ কোয়ে সনম কা রাহনুমা হ্যা ॥
(কালামে মাহমুদ, পরবর্তী ১০টি পংক্তি)

ইয়া 'আইনা ফাইযিল্লাহি ওয়াল 'ইরফানি
ইয়াস'আ ইলায়কাল খালকু কায্‌যামআনি ॥
(আরবী কাসীদার ১১-২০ পংক্তি)

দোয়া

❑ দোয়াগুলো অনুবাদসহ মুখস্ত করুন ঃ

● **নামাযের পরে দোয়াসমূহ**

● **আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালামু ওয়া মিনকাস্ সালামু তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইক্‌রাম**

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি শান্তি এবং তোমা থেকেই সকল প্রকার সান্ত্বনা; তুমি বড়ই কল্যাণময় হে মহা প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী খোদা!

● **আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিক্‌রিয়া ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ইবাদাতিকা-**

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে তোমার যিক্‌র (স্মরণ) করার, তোমার কৃতজ্ঞতা করার এবং সুন্দরভাবে তোমার ইবাদত করায় সৌভাগ্য দান কর।

● **আল্লাহুম্মা লা মানি'আ লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'আকা ওয়ালা ইয়ানফা'উ যালজাদ্দি মিন্‌কালজাদ্দু-**

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! যা তুমি দান করেছো তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না আর তুমি যা প্রতিরোধ করো তা কেউ দিতে পারে না।

❑ পায়খানায় যাওয়ার দোয়া

● **আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবসি ওয়াল খাবাইসি-**

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! প্রত্যেক অপবিত্র বস্তু ও অপবিত্র কাজ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

❑ পায়খানা থেকে বের হয়ে দোয়া ঃ

● **আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আযহাবা আন্নীল আযা ওয়া 'আফানী ওয়া আব্‌ক্বা ফী মানফা'আতিহী-**

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমার কষ্ট দূর করে দিয়েছেন আর আমাকে সুস্থতা দান করেছেন এবং উপকারী জিনিস অবশিষ্ট রেখেছেন।

আদব-কায়দা (শিষ্টাচার)

প্রতিবেশীর অধিকার বিষয়ে বিস্তারিত পাঠ (... পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

সৃষ্টিকর্তার গুণাবলী

সৃষ্টিকর্তার এসব গুণাবলী মুখস্ত করার পর এতদনুযায়ী দোয়ার অভ্যাস সৃষ্টি করুন ঃ

আল্ মু'ইয্‌যু - সম্মান দেয়ার অধিকারী। **আল্ মুযিল্লু** - লাঞ্ছনাদানকারী, **আল্ হাকামু** - বিচারক, **আল্ লাতীফু** - সূক্ষ্ম-তত্ত্ব-দর্শী, **আল্ খবীরু** - সর্ববিদিত। **আশ্ শূকর** - গুণগ্রাহী, **আল্ কবীর** - শ্রেষ্ঠ, **আল্ মুকীতু** - রিয্‌ক পৌছান যিনি, **আল্ হাসীবু**-যথেষ্ট করে দেন যিনি। **আল্ জালীলু** - সম্মানের অধিকারী, **আল্ কারীমু** - সম্মানীত।

সীরাত

১। সীরতে খাতামান্নবীঈন (সঃ) (হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ প্রণীত) প্রথম ১০০ পৃষ্ঠা পাঠ করুন।

২। সীরত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) (হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব প্রণীত)। (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নবী নেতা (সঃ) ও সীরতে সুলতানুল কলম পাঠ করা যেতে পারে)।

ধর্মীয় শিক্ষা

● কুরআন করীমে যেসব নবীদের নাম এসেছে সেগুলো মুখস্ত করুন। (ইসলামী ইবাদত পুস্তকের ১৭৩ পৃঃ দেখুন-অনুবাদক)

● সিহাহ্ সিত্তাহ্ (হাদীসের পুস্তক)-এর নাম মুখস্ত করুন। (ইসলামী ইবাদত পুস্তকের ২০২ পৃঃ দেখুন-অনুবাদক)

● হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ৫টি ইলহাম মুখস্ত করুন।

১। **ইয়াতূনা মিন কুল্লি ফাজ্‌জিন 'আমীক**

অর্থ ঃ প্রত্যেক গভীর রাস্তা দিয়ে তোমার নিকট লোকেরা আসবে।

২। **ইন্নী উহাফিযু কুল্লা মান ফীদ্দার**

(অর্থ ঃ তোমার গৃহের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক গৃহেরও প্রত্যেককে রক্ষা করবো।

৩। **আসমান সে দুধ উতরা মাহফুয রাক্‌খো**

অর্থ ঃ আকাশ থেকে দুধ অবতীর্ণ হয়েছে সংরক্ষিত করো।

৪। **কাদের হ্যা উওহ বারগাহ্ টোটা কাম বানা দে-বানা বানায়া তোড়ে দে কোই উসকা ভেদ না পাওয়ে**

অর্থ - বিচার সভায় তিনি সর্বশক্তিমান। বিশৃঙ্খল কাজ শুধ্‌রে দাও। সাধিত কাজ ভেঙ্গে দাও যেন কেউ এর রহস্য বুঝতে না পারে।

৪। **মাকান তাকিয়া বর উমরে না পায়েদার**

অর্থ ঃ এ নশ্বর জীবনের ওপরে ভরসা কোর না।

১৪ বছর থেকে ১৫ বছর বয়স্কদের পাঠসূচী

● যদি সম্ভব হয় তবে এ বছর ২০টি রোযা রাখবেন।

● পূর্ববর্তী পাঠ্যসূচীতে বর্ণিত সূরাগুলো, আদব-কায়দা, হাদীসগুলো, নযমগুলো এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলী পুনরাবৃত্তি করবেন।

প্রথম ৬ মাসের জন্যে

● কুরআন করীমের ৫ পারা থেকে ৬ পারা অনুবাদের সাথে পাঠ শেষ করবেন।

❑ কুরআনের অংশ অনুবাদসহ মুখস্ত করবেন ঃ সূরাতুল ক্বারিআহ্, সূরাতুত্তাকাসূর, সূরাতুল ক্বদর, সূরাতুল কাহ্‌ফ-এর ১ থেকে ১১ ও ১০৩ থেকে ১১১ আয়াত এবং সূরাতুল আহযাবের ৭০ থেকে ৭৪ আয়াত।

❑ অর্থ সহ হাদীস মুখস্ত করবেন ঃ

● **কাদাল ফাক্বরু আঁইয়াকূনা কুফরান**

অর্থ ঃ হতে পারে দারিদ্র কুফরী (অস্বীকার) পর্যন্ত নিয়ে যায়।

● **আল্ ইয়ামীনুল ফাজিরাতু তাদা'উদ্দিয়ারা বালাকিআ -**

অর্থ ঃ মিথ্যা কসম ঘরগুলোকে বিরান করে দেয়।

● **ইন্না মিনাশ্ শি'রি লাহিকমাতাঁওয়া ইন্না মিন্নাল বায়ানি লাসিহ্‌রান-**

অর্থ ঃ কতক কবিতা হয়ে থাকে বড়ই প্রজ্ঞাপূর্ণ আর কতক বক্তৃতা হয় তো যাদুস্বরূপ।

● চালিস জওয়াহের পারে (চল্লিশটি মহামূল্য রত্ন) - হাদীসের পুস্তকের প্রথম অর্ধেকটা পাঠ করবেন।

দোয়াটি অর্থ সহ মুখস্ত করবেন।

● কবরস্থানে প্রবেশ করার সময়ে দোয়া

আস্‌সালামু আলায়কুম ইয়া আহ্‌লাল কাবূরি ইয়াগফিরাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আসরি ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লালাহিকূন -

অর্থ ঃ হে কবরবাসী ! আপনাদের ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আপনাদেরকেও। আপনারা আমাদের অগ্রবর্তী আর আমরা আপনাদের পশ্চাদ্বর্তী এবং যদি আল্লাহ্‌তাআলা চান তাহলে আমরাও আপনাদের সাথে এসে মিলিত হবো।

আদব-কায়দা বা শিষ্টাচার ঃ

নিম্নোক্ত আদব-কায়দা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে পড়াশুনা করবেন।

কথাবার্তা বলার আদব, দেনা-পাওনার আদব, সাক্ষাতের আদব (... পৃষ্ঠা দেখুন)।

আল্লাহ্‌তাআলার গুণাবলী ঃ

মনে করে এতদনুযায়ী কাজ করবেন ও দোয়া করার অভ্যেস গড়ে তুলবেন।

আল্ হাফীযু - সংরক্ষণকারী, **আররকীবু** - পর্যবেক্ষণকারী, **আল্ মুজীবু** - গ্রহণকারী, **আল্ ওয়াদূদু**- যিনি ভালবাসেন। **আল্ মাজীদ** - মহা মর্যাদাবান, **আন্ বা'ইসু** - উত্থোলনকারী, **আল্ ওয়াকীলু** - কার্য নির্বাহক, **আল্ ক্বাবিয়্যু** - শক্তিমান, **আল্ মাতীনু**- শক্তিশালী, **আল্ হামীদু** - সৌন্দর্যবান, **আল্ মুহ্‌সী** - গণনাকারী, **আল্ মুবদী** - আদি স্রষ্টা, **আল্ মু'ঈদু** - দ্বিতীয়বার সৃষ্টিকারী - **আল্ মুহ্‌'ঈ** - জীবন দাতা, **আল্ মুমীতু** - মৃত্যুদানকারী।

জীবন-চরিত ঃ হযরত খাতামান্নবীঈন সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবন চরিত [হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) এম এ প্রণীত] পৃষ্ঠা ১০১ থেকে ২০০, আশারাহ্ মুবাশ্বিরাহ্ এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী, শামায়েলে আহমদ।

ধর্মীয় জ্ঞান - ১) চার ইমামের নাম ২) ধর্মীয় জ্ঞান (খোদ্দামুল আহমদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত। বাংলাদেশ এর জন্যে ইসলামী ইবাদত পুস্তক ২০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য - অনুবাদক)। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

(অমৃতবাণী ঃ ৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

এটা সম্ভব যে, ইয়েমেনের এলাকায়ও এই নামের কোন গ্রাম আছে। কিন্তু এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইয়েমেন হেজাযের পূর্ব দিকে নয় বরং দক্ষিণ দিকে। তবে পাঞ্জাবেও লুধিয়ানার নিকটে আরও একটি কাদিয়ান আছে।

এছাড়াও স্বয়ং নিয়তির প্রভাবে এই অধমের যে নাম রাখা হয়েছে, সেটাও এ বিষয়ের প্রতি এক সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বহন করছে। কেননা আরবী বর্ণমালার সংখ্যার মান গণনা হিসাবে, "গোলাম আহমদ কাদিয়ানী" এই কয়টি অক্ষরের সংখ্যা পুরোপুরি তেরশ' বছর হয়। অর্থাৎ এই নামের ইমাম চৌদ্দ শতাব্দীর শুরুতে আবির্ভূত হবেন। প্রকৃতপক্ষে আঁ হযরত (সঃ) এ দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

দৈব ও পার্থিব দুর্বিপাক

দুর্বিপাকও একটি লক্ষণ ছিল। দৈব-দুর্বিপাক দুর্ভিক্ষ, প্লেগ ও কলেরা মহামারীর রূপ ধারণ করেছিল। প্লেগ ঐ ভয়ঙ্কর আযাব যা গভর্ণমেন্টকেও প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। এটা বৃদ্ধি পেতে থাকলে দেশ জনশূন্য হয়ে যাবে। পার্থিব দুর্বিপাক যুদ্ধ ও ভূমিকম্প ছিল যা দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আপন সত্যতা প্রমাণের জন্য ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করা আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষের জন্য আবশ্যকীয়। লেখরামের নিদর্শনটি কি কিছু কম ছিল? মল্ল যুদ্ধের ন্যায় কয়েক বছর যাবৎ এটি একটি প্রকাশ্য শর্ত ছিল। ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসর যাবৎ এই যুদ্ধ চলতেছিল। উভয় পক্ষ বিজ্ঞাপন বিলি করেছে, সাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়েছে। এরূপ প্রচারণা যার তুলনা করাও কঠিন। যা প্রচার করা হয়েছিল অনুরূপ সে ঘটনাই ঘটেছে। এই ঘটনাটির আরও কোন দৃষ্টান্ত আছে কি? লাহোরে 'সর্ব ধর্ম সমন্বয়' উপলক্ষ্যেও কয়েকদিন আগেই ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে জানিয়েছেন যে, "আমার প্রবন্ধটি অন্যান্য সব প্রবন্ধের উপর বিজয়ী হবে।" যারা এই মর্যাদা ও প্রভাবশালী জলসায় উপস্থিত ছিলেন তারা চিন্তা করতে পারবেন যে, এরূপ সমাবেশে বিজয় লাভের আগাম সংবাদ দেয়া কোন অনুমান বা কল্পনা-প্রসূত নয়। যা বলা হয়েছিল পরিণামে তা-ই ঘটেছে। পরিশেষে আমাদের দোয়া হলো- "সকল প্রশংসা (একমাত্র) আল্লাহ্‌র, যিনি জগতসমূহের প্রভু-প্রতিপালক"। (চলবে) (মলফূযাত, প্রথম খন্ড)।

অনুবাদ- **মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা**

নতুনদের পাতা

হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম দরদ্

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ৩১৩ জন সাহাবীর অন্যতম হযরত মাষ্টার কাদের বক্স সাহেবের ঘরে জন্মগ্রহণকারী সন্তান মাওলানা আব্দুর রাহীম দরদ্ আহমদীয়তের আকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ও বিশ্বস্ত এই সেবক সকলের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব করায় পারদর্শী ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত। হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম দরদ্ ১৮৯৪ সালে পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত মাষ্টার কাদের বক্স হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রাথমিক যুগের সাহাবী। সবল চরিত্রের অধিকারী হযরত মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানওয়ারী সাহেব (লাল কালির ছিঁটার আসমানী নিদর্শনের সাক্ষী) তাঁর ফুফা ও শ্বশুর। ১৮৯১ ইং সালে লুধিয়ানায় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ও মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর মধ্যে যে মোবাহাসা হয়েছিল তাতে হযরত মাষ্টার কাদের বক্স উপস্থিত ছিলেন। এ সম্পর্কে সৈয়্যদনা হযরত (আঃ) ইযালায়ে আওহাম পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। লুধিয়ানায় হুযূরের (আঃ) দ্বিতীয় সফরে হযরত মাষ্টার কাদের বক্স হুযূরের (আঃ) হাতে বয়াত করেন। বয়াতের পর থেকে কাদের বক্স সাহেবের পিতা তাঁকে মারপিট করতেন। কিন্তু তিনি সব সময় পিতার খেদমতে রত ছিলেন। তিনি গালি শুনেও আহমদীয়তের প্রচার করতেন। পরে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার ফলে তাঁর পিতার ব্যবহার অনেক কোমল হয়ে যায়। তিনি মোখালেফাত বন্ধ করেন।

হযরত মাষ্টার কাদের বক্স সাহেবের বোনের বিয়ে হযরত মৌলভী আবদুল্লাহ্ সানওয়ারী সাহেবের সাথে হয়। এ বিয়ে হযরত আকদস (আঃ) দেন। হযরত দরদ্ সাহেবের পিতা ও মাতা দু'জনে ১৯০২ সালে আহমদী হওয়াতে তিনি জন্মসূত্রে আহমদী ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা মাতার ৩ ছেলে ও ২ মেয়ের সবার বড়। প্রথমে তাঁর নাম রাখা হয় রহীম বক্স। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তাঁর নাম আব্দুর রহীম দরদ্ রাখেন।

হযরত মাওলানা দরদ্ সাহেব লুধিয়ানায় প্রারম্ভিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ও ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি তাঁর পুস্তক 'আমার পিতা'-তে লিখেছেন "আমি প্রথম বার কাদিয়ানে আসি ১৮৯৯ সালে। ইহা আমার বেশ মনে আছে। তখন আমার বয়স সাড়ে চার বছর। আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। হুযূরের (আঃ) দোয়াতে সুস্থ হয়ে উঠি।" হযরত মুন্সি বরকত আলি সাহেব হযরত মাষ্টার কাদের বক্স সাহেবের মৃত্যুতে এক প্রবন্ধ লেখেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন "২য় খলীফা হযরত মুসলেহ্ মাওউদের (রাঃ) প্রাইভেট সেক্রেটারী মাওলানা আব্দুর রহীম দরদ্ যখন ৯ম/১০ম শ্রেণীতে পড়ে, তখন পিতা প্রায় বলতেন, আমার ছেলের জন্য আমার কোন দুঃশ্চিন্তা নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তার জন্য খাসভাবে দোয়া করেছেন"।

মাওলানা দরদ্ সাহেব ১৯১৪ সালে লাহোর থেকে বি,এ পরীক্ষা দেন। এ সময় তিনি লাহোর আহমদীয়া হোষ্টেলে থাকার সুযোগ পান। আহমদীয়া হোষ্টেল অনেকদিন পর্যন্ত আহমদী যুবকদের ধর্মীয় ও জাগতিক কার্যক্রমের কেন্দ্র বিন্দু ছিল। এ সেই কেন্দ্র যেখান থেকে হযরত মালিক গোলাম কাদের সাহেব হযরত মালিক আব্দুর রহমান সাহেব খাদেম, হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম দরদ্ সাহেব, হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব, হযরত শেখ বশীর আহমদ সাহেব, হযরত শেখ মোহাম্মদ আহমদ মাযহার সাহেব এবং হযরত মির্যা আব্দুল হক সাহেবের মত ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) যখন লাহোর যেতেন তখন আহমদীয়া হোষ্টেলে থাকতেন, যাতে ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষা ও তরবিয়ত ভাল হয়। সে সময় মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেবের মত ব্যক্তি এ হোষ্টেলের নামায ও দরসের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন।

মাওলানা দরদ্ বি, এ, পাশ করার পর হুশিয়ারপুরে মিশন স্কুলে চাকুরী নেন। ১৯১৬ সালে তিনি লাহোর ইসলামীয়া কলেজ থেকে আরবীতে এম, এ পাশ করেন। ১৯১৫ সালে তাঁর প্রথম বিবাহ মালীর কোটলার মিয়াঁ মহম্মদ ইসমাঈল সাহেবের মেয়ে সারা বেগম সাহেবার সাথে হয়। হযরত খলীফা সানী (রাঃ) কাদিয়ানে ১৯১৭ সালে তাঁর ২য় বিবাহ হযরত মৌলভী আবদুল্লাহ্ সানওয়ারী সাহেবের মেয়ে মরিয়ম বেগমের সাথে দেন।

হযরত মাওলানা সাহেব ১৯১৯ সালে জীবন উৎসর্গ করেন এবং স্থায়ীভাবে কাদিয়ানে বাস করতে থাকেন। তিনি কাদিয়ানে আসার সাথে সাথে হুযূর (রাঃ) আহমদীয়া মাদ্রাসাকে কলেজে রূপান্তরিত করার কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। সে সময় আহমদীয়তের প্রচারের জন্য বেশী মোবাল্লেগের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই কমিটি সকল দিক বিবেচনা করে রিপোর্ট পেশ করে। ১৯২০ সালে হুযূর দরদ্ সাহেবকে চিঠি-পত্রের জবাব দেবার কাজে নিয়োগ করেন। পরে এই পদকে প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে রূপান্তরিত করা হয়। এই পদে তিনি ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন। পরে আবার তিনি এই পদে ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

১৯২৪ সালে ইংল্যান্ডের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্দ্যোগে ওয়েমব্লে সম্মেলন নামে একটি ধর্মীয় সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে উপস্থাপনার জন্য হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ 'আহমদীয়াত আওর হাকীকী ইস্লাম' লেখেন। বহির্বিশ্বের জামাতের পরামর্শক্রমে তিনি ১৯২৪ সালের ২রা আগষ্ট লন্ডনে পৌছান। এ সফরে হুযূরের সাথে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহীম দরদ্। মাওলানা সাহেব এই সম্মেলনে হুযূরের প্রবন্ধ পাঠ ও আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯২৪ সালের ১৯শে অক্টোবর লন্ডনের মসজিদ ফযলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। হযরত মাওলানা দরদ্ সাহেব এ অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন এবং স্বাগত ভাষণে মেহমানদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। হুযূর নভেম্বরে লন্ডন থেকে তাঁর সফর সঙ্গীদের নিয়ে কাদিয়ানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মাওলানা আব্দুর রহীম নাইয়ার সাহেবের স্থলে মাওলানা দরদ্ সাহেবকে লন্ডন মিশনের দায়িত্বে রেখে আসেন। মাওলানা মালিক গোলাম কাদির সাহেবকে তাঁর সহকারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। দরদ্ সাহেব লন্ডন মিশনের দায়িত্ব পাওয়ার সাথে সাথে জামাতের মুখপাত্র মাসিক 'রিভিউ অফ রিলিজিয়নস্' পত্রিকা কাদিয়ানের পরিবর্তে লন্ডন থেকে প্রকাশ হতে থাকে। এ সময় লন্ডন থেকে 'মুসলিম টাইমস্' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশ হয়। তাঁর অবস্থানকালে লন্ডনের মসজিদ ফযলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। তিনি মসজিদ ফযলের প্রথম ইমাম। এ সময়ে তিনি তবলীগের জন্য জার্মানী ও

আলবেনিয়া ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ করেন। চার বছর ইংল্যান্ডে দায়িত্বে পালন শেষে ১৯২৮ সালের ২২শে অক্টোবর তিনি কাদিয়ানে প্রত্যাবর্তন করেন। আসার পথে তিনি তবলীগের জন্য কিছু দিন সিরিয়া ও ইরাকেও অবস্থান করেন। হুযূর (রাঃ) মাওলানা দরদ্ সাহেবকে স্বাগত জানানোর জন্য কাদিয়ান থেকে রওনা হয়ে তিন মাইল দূরে আসেন এবং বাটালার সড়কে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান।

কাশ্মীর উপত্যাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ ১৯৩০ সালে ডোগরা রাজাদের অত্যাচারের শিকার হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর মনে এ বিষয়ে গভীর রেখাপাত করে। তিনি তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। ১৯৩১ সালের ৩রা জুলাই কাশ্মীরের মজলুম মুসলমানদের উপর গুলি চালানো হলে হুযূর হিন্দুস্থানের গভর্নর জেনারেলকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কাশ্মীরের প্রশাসনের নির্যাতনমূলক কার্যক্রমের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি ভারতে সকল মুসলমান নেতৃবৃন্দকে ২৫শে জুলাই এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিমলাতে একত্রিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানান। হুযূর (রাঃ) সিমলা সম্মেলনে ডঃ স্যার মহম্মদ ইকবাল, খাজা হাসান নিজামী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের অনুরোধে অল ইন্ডিয়া কাশ্মীর কমিটির চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করেন। সকলের অনুমোদনক্রমে হযরত মাওলানা দরদ্ সাহেব কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী হন। এ সম্মেলনে ডঃ স্যার মহম্মদ ইকবাল, খাজা হাসান নিজামী, স্যার মিয়াঁ ফযল হোসেন, স্যার জুলফিকার আলি খান, মাওলানা ইসমাইল গযনভী প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা দরদ্ সাহেব জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করেন। সম্মেলনের পর বেশ কিছু দিন হুযূর (রাঃ) সিমলাতে ছিলেন। তাঁর নির্দেশে দরদ সাহেব প্রশাসনের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করেন। ভারতের গর্ভনর জেনারেলের রাজনৈতিক সচিব দরদ্ সাহেবের সাথে আলোচনায় এত মুগ্ধ হন যে, তিনি নিজে হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ করে কাশ্মীর পরিস্থিতি সম্পর্কে মত বিনিময় করেন। ১৪ই আগষ্ট, ১৯৩১ তারিখ কাশ্মীর দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দরদ্ সাহেব দিবসের জন্য একটি সুন্দর পুস্তক প্রকাশ করেন। কাশ্মীরের জনগণ আহমদীদের খেদমতের কথা জানতেন। ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে কাশ্মীরের নেতা শেখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ হুযূরের নিকট তাঁর প্রতিনিধিকে কাশ্মীরের মহারাজার নিকট মত বিনিময়ের জন্য পাঠানোর অনুরোধ করেন। হুযূর দরদ্ সাহেবকে কাশ্মীরে পাঠান। মাওলানা সাহেব কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী ও প্রশাসনের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করে কাশ্মীরের অধিবাসীদের প্রতি সুবিচারের অনুরোধ জানান। ১৯৩২ সালে জুলাই মাসে শেখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ লাহোর আসেন। কাশ্মীর কমিটির চেয়ারম্যান হযরত মুসলেহ মাওউদের (রাঃ) সাথে সাক্ষাত করেন এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, শ্রীনগরে সমগ্র জম্মু কাশ্মীর মুসলিম রাজনৈতিক সম্মেলন হবে। শেখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ জানান যে, এত বড় সম্মেলন করার অভিজ্ঞতা তাদের নেই। সেজন্য তিনি দরদ্ সাহেবকে এ সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার জন্য পাঠানোর অনুরোধ করেন। ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোর অল ইন্ডিয়া কাশ্মীর কমিটির সম্মেলন হয়। দরদ্ সাহেব এই সম্মেলনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন ও কমিটির আর্থিক ভিতও সুদৃঢ় করে দেন। কমিটির এক সভায় মাওলানা দরদ্ সাহেবের প্রশংসা করা হয়। হুযূর আকদসের নেতৃত্বে মাওলানা দরদ্ সাহেব কাশ্মীরের মুসলমানদের অধিকার আদায়ে যে কাজ করেন তার প্রশংসা করে শেখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ হুযূরকে লেখেন, "আপনিও আপনার প্রেরিত দরদ্ সাহেব যে কাজ করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করার মত ক্ষমতা, লেখনীর ভাষা ও শব্দ আমার জানা নেই"

হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম দরদ্ সাহেব ১৯৩৩ সালে দ্বিতীয় বার লন্ডনে রওনা হন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত হেকীম ফজলুর রহমান সাহেব। লন্ডনে তিনি তবলীগের কাজের সম্প্রসারণ করেন। তিনি স্পেনেও তবলীগের কাজে যান। এ সময় কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ সাহেব লন্ডনে ছিলেন। তিনি ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর নির্দেশে মাওলানা দরদ্ সাহেব কায়েদে আযমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁকে ভারতে ফিরে মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "হুযূরের প্রচেষ্টা ছিল কায়েদে আযম লন্ডন থেকে ভারতে এসে যেন মুসলমানদের নেতৃত্ব দেয়। যার ফলে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হয়। যখন আমি ১৯৩৩ সালে ইংল্যান্ডে যাই সে সময় কায়েদে আযম ওখানে ছিলেন। আমি তাঁর সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করি এবং তাঁকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে মুসলমানদের নেতৃত্ব দানের বিষয়ে বোঝাতে সক্ষম হই। তাঁকে জানাই যে, এই সঙ্কটময় সময়ে মুসলমানদের দেখার কেউ নেই। যদি এখন মুসলমানদের মাঝিবিহীন নৌকাকে নদী পারের ব্যবস্থা না করেন তবে এরূপ দূরে থাকার অর্থ জাতির প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন।" এর পর কায়েদে আযম লন্ডনে ভারত সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলন করেন এবং ভারতে এসে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে দেন।

কায়েদে আযম ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে ঈদুল আযহার সময়ে মসজিদ ফযলে আসেন। ভারত সম্পর্কে এক বক্তব্যে বলেন, "ইমাম সাহেবের জ্ঞান-পূর্ণ প্রচেষ্টা ও মুক্তির জন্য আমার পক্ষে ভারতে ফেরত যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই"। কায়েদে আযমের মসজিদ ফযলে আসা সংক্রান্ত সংবাদ ১৯শে এপ্রিল লন্ডন টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২৩শে জুলাই, ১৯৩৩ তারিখে মুহাম্মদ লিয়াকত আলি খান কায়েদে আযমের সাথে দেখা করতে এলে তিনি তাঁকে ভারতে গিয়ে ওখানের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করানোর কথা বলেন।

প্রকৃত সত্য এই যে, কায়েদে আযমের রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন হুযূরের প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল। এর বাস্তবায়ন হয় মাওলানা আব্দুর রহীম দরদ্ সাহেবের মাধ্যমে।

১৯৩৮ সালের ৯ নভেম্বর মাওলানা দরদ্ সাহেব ইংল্যান্ড থেকে কাদিয়ানে ফেরত আসেন। তাঁর সাথে আসেন মৌলভী শের আলী সাহেব, হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব (৩য় খলীফা) হযরত মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব ও মির্যা জাফর আহমদ সাহেব। এই ৩ জন সাহেবযাদা মাওলানা সাহেবের লন্ডন অবস্থানকালে ওখানে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। কাদিয়ানে এসে মাওলানা সাহেব হুযূরের খুব নিকট থেকে জামাতের খেদমতের সুযোগ পান। এ সময় তাঁকে নেযারতে তা'লীম ও তরবিয়ত এবং নেযারতে দাওয়াত ও তবলীগের দায়িত্ব দেয়া হয়। দ্বিতীয় খেলাফতের জুবিলী জলসা পালনের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তার সম্পাদক ছিলেন মাওলানা দরদ্ সাহেব। জুবিলী জলসা হুসিয়ারপুরে হয়। মাওলানা সাহেব জলসায় মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত

ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করে শ্রোতাদের শোনান। এজন্য বিশেষভাবে মাওলানা সাহেবকে নির্বাচন করা হয়। তাঁর ফুফা ও শ্বশুর অর্থাৎ হযরত মুন্সি আবদুল্লাহ্ সানওয়ারী সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদের (আঃ) হুসিয়ারপুর সফরে সাথী ছিলেন। এ সময়ে হুযূর (আঃ) চিল্লাকশী করেন এবং মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ইলহাম পান।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় আহমদীদের নিরাপত্তার সাথে পাকিস্তানে হিজরত করার বিষয়ে মাওলানা দরদ সাহেব বিরাট ভূমিকা পালন করেন। তিনি এ সময় ভারত ও পাকিস্তানের প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তানে হিজরতের পর মাওলানা সাহেব নেযারতে উমুরে আমা ও উমুরে খারেযা এবং নেযারতে তা'লীম ও তরবিয়তের দায়িত্বে ছিলেন। এক সাথে এতগুলি দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হওয়া থেকে বোঝা যায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদের (রাঃ) নিকট তাঁর সততা ও কর্মদক্ষতা কত উচ্চ মার্গের ছিল।

আহমদীয়তের এই উচ্চাংগের খাদেম ও বিশাল ব্যক্তিত্ব ১৯৫৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর নিজ প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেন। দৈনিক আল্ ফযলে লেখা হয় যে, তাঁর মৃত্যু শাহাদাৎ এর রং এ রঙিন। তিনি যথারীতি তাঁর দপ্তরে আসেন এবং নাযেরে আলা হযরত মির্যা আযীয আহমদের টেবিলের এক পাশে বসে কাজ করতে থাকেন। সোয়া বারটার সময় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সাথে সাথে তাঁকে বাড়ীতে নেয়া হয়। ২টার সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরের দিন ৮ই ডিসেম্বর যুহরের নামাযের পর হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বেহেশ্‌তি মকবরাতে তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম দরদ্ সাহেবকে জ্ঞান ও লেখনীর এক বিশাল ভান্ডার দান করেছিলেন । তিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তবলীগ ও প্রশাসনিক কাজের সাথে সাথে ধর্মীয় গবেষণা ও লেখার কাজ করেন। তাঁর পুস্তকগুলি ইংরেজী ও উর্দূ ভাষাতে লেখা। উল্লেখযোগ্য পুস্তকগুলি হ'ল, লাইফ অফ আহমদ, ইসলামী খেলাফত, মুসলমান আওরত কি বুলন্দশান। বানী সিলসিলাহ্ আহমদীয়ত আওর ইংরেজ প্রভৃতি। লাইফ অফ আহমদ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবনী গ্রন্থ। জামাতের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনেক। তিনি এ পুস্তক দুখন্ডে প্রকাশ করেন। তিনি কবিতা লেখায়ও পান্ডিত্য রাখতেন। তাঁর একটি কবিতার বইয়ের নাম "ওয়াদিয়ে খেয়াল"।

হযরত মাওলানা দরদ্ সাহেবের দুই স্ত্রী মোট ৬ ছেলে ও ৮ মেয়ে আছে। তাঁর প্রায় সব সন্তান ও জামাতা জামাতের খেদমতে নিয়োজিত আছেন। জামাতের ২য় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) মাওলানা আব্দুর রহীম দরদ্ সাহেবের মৃত্যুর পর জুমুআর খুতবায় বলেন "দরদ্ সাহেব যখন জামাতের খেদমতে আসেন তখন তাঁর বয়স কম ছিল। তার কাজের ধারা এরূপ ছিল যে, যখন আমি তাঁকে কোন বড় অফিসারের কাছে পাঠাতাম, তিনি সাফল্যের সাথে জামাতের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাঁর মনে কোন দিন এরূপ চিন্তা আসে নি যে, তারা পদমর্যাদায় বড় এবং আমি দুর্বল মানুষ। এখনকার সরকারের সময়ে কোন কলেজের প্রফেসারকে গর্ভনরের কাছে কোন কাজের জন্য পাঠালে তা তিনি করতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু দরদ্ সাহেবের মনের এরূপ দৃঢ়তা ছিল যে, তিনি মনে করতেন আমি দুর্বল মানুষ হলেও কাজটি খোদার। তা কেন আমি করতে পারবো না"।

দরদ্ সাহেবের কুরবানী সেবা ও খোদার পথে দৃঢ়তা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন, "আমার মনে আছে যখন আমি দরদ্ সাহেবকে বিলেতে পাঠাই তখন তাঁর ভাতা ছিল একশ' টাকা। চাঁদা আদায়ের পর তাঁর ৬০ টাকা থাকত। এর একটি বড় অংশ তিনি মা-কে পাঠাতেন। তাঁর দুই বিবি এবং প্রত্যেকের ৪ টি করে বাচ্চা ছিল। তিনি আমাদের বাড়ীর কাঁচা অংশে থাকতেন। যেখানে আজকাল কোন ক্লার্কও থাকতে চাইবে না। চিন্তা করুন, তিনি এম, এ পাশ ছিলেন। তাঁকে সাব জজের চাকুরী করার জন্য ডাকা হয়েছিল। যখন বিদেশে যেতেন তখন জামাতের এরূপ সামর্থ্য ছিল না যে, তাঁর বিবি বাচ্চাদের ভালভাবে চলার ব্যবস্থা করা যায়। তা সত্ত্বেও তিনি দৃঢ় চিত্তে জামাতের খেদমতে চল্লিশ বছর কাটিয়েছেন।

তাঁর মৃত্যুতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) বলেন, "দরদ্ সাহেব এরূপ এবং পবিত্র বংশের সন্তান যে বংশের স্থান ও মর্যাদা আহমদীয়তের ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছে। দরদ্ সাহেব মসীহ্ মাওউদের (আঃ) সাহাবী ছিলেন। মসীহ্ মাওউদের অনেক ঘটনা তাঁর মনে ছিল যা সিরাতুল মাহদী পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। জামাতের জন্য তাঁর সেবা ২য় খেলাফতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমি এবং দরদ্ সাহেব একসাথে এম, এ পাশ করেছি। আমার মনে আছে, আমরা দু'জন যখন খোদার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে জামাতের জন্য জীবন উৎসর্গ করি তখন এই প্রতিজ্ঞা করি যে, খোদার তওফীকে আমরা সর্বদা জামাতের কাজে জীবন কাটাব। কখনও নিজের উন্নতি ও অধিকারের বিষয়ে চিন্তা করবো না। আমার জন্য খুবই আনন্দের এবং দরদ্ সাহেবের পরিবারের জন্য গর্বের কথা যে, দরদ্ সাহেব তাঁর প্রতিজ্ঞা দৃঢ়-চিত্তে সম্পন্ন করেছেন"। হযরত বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) আরও বলেন, "বিলেত থেকে ফেরার পর দরদ্ সাহেব বেশীর ভাগ সময় নেযারত তা'লীম ও তরবিয়ত এবং তবলীগের দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিশেষ কাজ নেযারতে উমুরে খারেজাতে ছিল। যেখানে তিনি অস্বাভাবিকভাবে কৃতকার্য হয়েছেন। সরল ব্যবহার ও সাধারণ পোষাকে থাকার জন্য অনেক সময় দরবেশ মনে হ'ত। কিন্তু যখন চমৎকার দক্ষতার সাথে কারও সাথে দেখা করতেন তখন তারা অভিভূত হয়ে পড়তেন। দরদ্ সাহেব সব সময় নিজের পক্ষে তাদের মত নিতে সক্ষম হতেন।

হযরত মাওলানা আবুল আতা সাহেব হযরত দরদ্ সাহেব সম্পর্কে লেখেন, "দরদ্ সাহেব আহমদীয়া জামাতের মধ্যে আদর্শ ব্যাক্তিত্ব ছিলেন। তিনি পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও ভালবাসার সাথে জামাতের কাজ করেছেন। তিনি দিন রাত কাজ করতেন। তবুও বলতেন, তিনি তাঁর দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারছেন না। তিনি নিজে লেখালেখিতে ব্যস্ত রাত কাটাতেন এবং জামাতের বন্ধুদেরকে পুস্তক ও প্রবন্ধ লেখার অনুপ্রেরণা যোগাতেন। তিনি নিজের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের সাথে সব সময় ভালবাসার সাথে মিলিত হতেন।

"মায়া কেয়া চিজ হ্যায় আওর জান কি হকিকত কেয়া হ্যা আবরু তুঝপর ফিদা করনে কো তৈয়ার হ্যাঁ হাম"-দরদ্

সংগ্রহ ও অনুবাদ

-কওসার আলি মোল্লা

[তথ্য সূত্রঃ মাসিক আনসারুল্লাহ্, জুন ১৯৯৭]

নতুনদের পাতা

ইসলামে নারীর মূল্যায়ন

সৃষ্টি কৌশলীর এক অপূর্ব ও মহান সৃষ্টি নর ও নারী। কথিত আছে নরের শান্তির জন্যই স্রষ্টা সৃষ্টির প্রথম দিনে সৃষ্টি করেন নরের জন্য নারীরূপ কল্যাণীয়াকে। নর ও নারীর সামগ্রিক প্রচেষ্টা এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে এই ধরা তলে জান্নাতের সমীরণ প্রবাহিত হয় যুগে যুগে। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, তাঁর নিদর্শনসমূহের মাঝে এটিও একটি নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন (৩০ঃ২০)। কিন্তু এ নারী জাতিকে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে দেখা হয়। বিভিন্ন কষ্টি পাথরে তার মান যাচাই করা হয়। হিন্দু ধর্মে নারীকে নরের দাসীরূপে স্থান দেয়া হয়েছে। নারী নরের 'জনম জনম কা দাসী'। খৃষ্ট ধর্মে নারীকে নরকের প্রবেশ পথ বলে অভিসম্পাত করা হয়েছে। নারী অভিশপ্ত পাপীনি ও সব অকল্যাণের মূল উৎস। তবে ইসলাম ধর্মই নারীকে নরের সাথে সুষম সম-মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। নর ব্যতিরেকে নারীর জীবন যেমন পূর্ণাঙ্গ নয় তেমনি নরের জীবনও নারী ব্যতিরেকে অপূর্ণাঙ্গ। নিম্নে তা তুলনামূলক আলোচনা করা হ'ল ঃ

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী সমাজ

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ধর্মে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে নারী জাতির কোন প্রকার অধিকার ছিল না। দুনিয়ার কোথাও তাদিগকে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হিসাবে উপযুক্ত মর্যাদা দেয়া হত না। পিতৃ গৃহে কন্যাগণ ভৃত্যের ন্যায় বসবাস করত। তারা পুরুষের চোখে ঘৃণার পাত্রী ছিল। পিতা যুবতী কন্যাকে বিক্রয় ও হস্তান্তর করার অধিকারী ছিল। নারীগণ পণ্য হিসাবে গণ্য হবার কারণে কোন সম্পত্তির অংশীদার ছিল না। সব প্রাচীন জাতির সামাজিক রীতিতে স্ত্রী ছিল স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের দাসী। ব্যবীলনীয় ও মিশরীয় নারীরা ছিল পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তি ও যৌন ভোগের সামগ্রী বিশেষ। হিব্রু, হিন্দু, মেড্‌স, অ্যাসিরিয় এবং পারসিক সহ প্রাচ্যের সকল প্রাচীন জাতির মধ্যেই বহু বিবাহ একটি স্বীকৃত প্রথা হিসাবে প্রচলিত ছিল। পুরুষের স্ত্রীর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। কোন কোন পরিবারে অসংখ্য পত্নী ও উপপত্নী রাখা হ'ত। ভরণপোষণ ছিল পুরুষের দয়ার উপর নির্ভরশীল। প্রাচীন ইহুদীদের মধ্যে মুতা বিবাহ নামে এক প্রকার শর্তাধীন অস্থায়ী বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। স্ত্রীর যৌবনের লাবণ্যভাব চলে গেলে সে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে পড়ত। তারা পর জাতির নারীগণকে বলপূর্বক দাসী হিসাবে সকল প্রকার পাশবিক অত্যাচার করত। প্রাচীন রোম রাজ্যে নারীদেরকে নিয়ে প্রমোদ মেলা বসত। এথেন্স রাজ্যের নারীগণকে গরু-ছাগলের ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় করা হত। ফ্রেসিয়ান নারীদের জন্য কোন প্রকার অবরোধ প্রথা ছিল না। গ্রীকে যুদ্ধবন্দিনী রমণীগণকে উপ-পত্নীরূপে রাখা হ'ত।

খৃষ্ট ধর্ম মতে আদম ও হাওয়া (ইভ) যখন স্বর্গে ছিলেন তখন হাওয়াই শয়তানের প্ররোচনায় প্রথম ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে নিজে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেন এবং আদমকে দিয়েও ভক্ষণ করান। সেই পাপের জন্যই ঈশ্বর উভয়কে স্বর্গ হতে বিতাড়িত করে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন। ফলতঃ হাওয়া (ইভ) অর্থাৎ একজন নারীর পাপের কারণে সমগ্র মানব জাতি চির পাপী হয়। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ছিল মনুষ্য-পুত্র যীশুর আগমন এবং মানব জাতিকে পাপমুক্ত করা। সে জন্যই খৃষ্টান পাদ্রীগণ নারীকে শয়তানের যন্ত্র ও কামড় দেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত বিচ্ছু ইত্যাদি কু-আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। হযরত নূহ (আঃ)-এর সময় নারীদের উপর এত বেশী পাশবিক নির্যাতন হয় যার ফলশ্রুতিতে পরাক্রমশালী খোদা কর্তৃক মহা প্লাবন প্রদত্ত হয়। মিশরের বাদশা ফেরাউন তার রাজ্যে কোন সুন্দরী মেয়ের সন্ধান পেলে তাকে ধর্ষণ না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হ'ত না।

প্রাচীন ভারতে রাক্ষস বিবাহ, পৈশাচিক বিবাহ, গান্ধর্ব বিবাহ এবং কৌলিণ্য প্রথা নামে অসংখ্য যৌন মিলনের পন্থা ছিল। তখনকার নারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তার 'বেদ বাণী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন - "বৈদিক যুগে বহু যুবতীর বিবাহ হতো না। তারা কুমারী অবস্থাতেই পিতৃগৃহে থাকত। বিকলাঙ্গ কন্যাদের বিবাহ হ'ত না। বিবাহ হয়ে গেলে কন্যার পৈতৃক সম্পত্তিতে আর অধিকার থাকত না। এ জন্য কন্যার ভ্রাতারা ভগ্নীর বিবাহ দিতে চেষ্টিত থাকত। বিধবা প্রায়ই স্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ করত। এ জন্য স্বামীর ভ্রাতার নাম হয়েছিল দেবর (দ্বিতীয় বর)। পুরুষেরা বহু বিবাহ করত। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ব্যভিচারই নিন্দনীয় ছিল না। কন্যা হরণ করেও বীরগণ বিবাহ করত। বিধবা হলে পত্নী পতির চিতায় শয়ন করে দেবরের আহ্বানে উঠে আসত ও পতির শব দাহ করত" (পৃষ্ঠা ৩২৪-৩২৭)।

প্রাক-ইসলামী যুগে আরব দেশে নারীগণকে জীব-জন্তু হিসাবে মূল্যায়ন করা হ'ত। কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে পিতা কখনও কখনও কন্যার হৃদয় বিদারক চিৎকার উপেক্ষা করে তাকে জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে দিত। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন- পিতাকে যখন কেউ কন্যা সন্তানের জন্মের সংবাদ দেয় তখন তার মুখ - মন্ডল কালো হয়ে যায়। এবং সে মনোকষ্ট অবদমন করতে থাকে। তাকে যার সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া হয়েছে এর অমঙ্গল হেতু লোক সমাজ হতে সে আত্মা গোপন করে বেড়ায় এবং ভাবে এ অপমান সহ্য করে মেয়েটিকে জীবিত রাখবে না মাটিতে পুঁতে দিবে ? (১৫ঃ৫৯-৬০)। সুতরাং পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তথা জীবন ধারণের সর্বক্ষেত্রে নারী জাতির কোন প্রকার অধিকার ও মর্যাদা ছিল না।

ইসলামে নারীর মর্যাদা

মানব জাতির পূর্ণ আদর্শ বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ণ ইসলামের শরীয়তের বিধানে সেই অবহেলিত লাঞ্ছিত নারী জাতিকে অমানিশার ঘোর অন্ধকারের অতল গহ্বর হতে উঠিয়ে নরের মন রাজ্যের রানীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ইসলামে পুরুষ ও নারীর মহান অধিকার ও মহান মর্যাদা। কেননা উৎপত্তির দিক দিয়ে উভয়কে একই উপাদান হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। উভয়ই আশরাফুল মখলুকাত হিসাবে স্বীকৃত। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন- তিনি তোমাদেরকে একটি সত্তা হতেই সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবন সঙ্গিণীকে একই উপাদান হতে সৃষ্টি করছেন (৪ঃ২)। আল্লাহ্‌তাআলা আরও বলেন- স্ত্রীগণেরা তোমাদের জন্য পোশাকস্বরূপ এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাকস্বরূপ (২ঃ১৮৮)। পোশাক দ্বারা মানুষ যেমন ধূলাবালি হতে শরীরকে বাঁচায়, শীত গ্রীষ্মের কষ্টের সাহায্য পায়, ভদ্রতা রক্ষা করে, সম্মান বর্ধিত করে এবং পরিচিতি প্রকাশ করে তেমনি স্বামী স্ত্রী উভয়েই পরস্পরের পোশাকস্বরূপ উপকারে আসে। অর্থাৎ উভয়ে একে অপরের দ্বারা স্ব স্ব প্রবৃত্তির তাড়নাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে ঐশী প্রেরণার মাধ্যমে সৃষ্টির উদ্দেশ্য তথা খোদাতাআলার নৈকট্য লাভ করতে পারে।

খৃষ্ট ধর্মে হাওয়া (ইভ) অর্থাৎ একজন নারীর পাপের কারণে সমগ্র মানবজাতির চির পাপী হবার ধারণাটি ভ্রান্ত। কারণ মানুষ মৃত্যুর পর যে স্বর্গ লাভ করে সেখানে আদম ও হাওয়া কখনও ছিলেন না এবং সেখান থেকে তাদিগকে দুনিয়াতে নির্বাসিত করা হয় নি। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, যে

একবার বেহেশ্‌তে প্রবেশ করে তাঁকে আর সেখান থেকে বহিষ্কার করা হয় না (১৫ঃ৪৯)। বিবি হাওয়ার কথায় হযরত আদম (আঃ) অনিচ্ছাকৃতভাবে নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়। অনিচ্ছাকৃত ভুল কখনও পাপ বলে গণ্য হয় না। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন -ইতঃপূর্বে নিশ্চয় আমরা আদমকে (এক বিষয়ের) তাগিদ করেছিলাম। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমরা তার মধ্যে আদেশ লংঘনের কোন সংকল্প পাই নি (২০ঃ১১৬)। আল্লাহ্‌তাআলা আরও বলেন, যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করবে তাকে কেবল তদনুরূপ প্রতিফল দেয়া হবে এবং যে ব্যক্তি মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করবে সে পুরুষ হোক বা নারী হোক জান্নাতে প্রবেশ করবে (৪০ঃ৪১)। অর্থাৎ নারী পুরুষ উভয়ে তার কর্ম অনুযায়ী ফল পাবে। পাপ-পুণ্যের জন্য নর-নারী উভয়েই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। একের পাপের জন্য অন্যে কিংবা সমগ্র মানবজাতি পাপী নয়। উভয়ের স্বর্গ লাভ করার সম অধিকার আছে।

হযরত রসূল করীম (সঃ) নারীর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, যার স্ত্রী নেই সে প্রকৃত পক্ষেই দরিদ্র, যদিও তার প্রচুর সম্পদ আছে। যে মহিলার জীবন-সঙ্গী স্বামী নেই সে প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতই দরিদ্র (8500 Precious Gems হতে উদ্ধৃত)। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী একে অপরের মহা অমূল্য সম্পদ এবং সম পর্যায়ের সম্পদের অধিকারী। হুযূর (সঃ) আরও বলেন- পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী আবাসস্থল। পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সম্পদের মধ্যে পুণ্যবতী মহিলা অপেক্ষা কোন উত্তম সম্পদ নেই (ইবনে মাজা)। অর্থাৎ পুরুষের জন্য পৃথিবীর সকল সম্পদ হতে উৎকৃষ্ট সম্পদ হ'ল তার ধার্মিকা স্ত্রী। সে জন্য স্ত্রীকে ধার্মিকা হওয়া আবশ্যক। ইসলাম তথা হযরত রসূল করীম (সঃ) আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, কোন মু'মিন নিজ মু'মিন স্ত্রীর সঙ্গে ঘৃণা এবং বিদ্বেষ রাখা উচিত নয়। সে যদি স্ত্রীর একটি দোষের জন্য অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আর একটি গুণের জন্য তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে (মুসলিম)। যা তুমি আহার কর উহা তাকেও খেতে দাও। যা তুমি পরিধান কর তাকেও সেরূপ পরিধান করতে দাও। তার মুখমন্ডলে আঘাত করবে না এবং গাল-মন্দ দিবে না। তার সঙ্গে ঘরের ভিতর ছাড়া বাইরে বিরহ অবলম্বন করো না (আবূ দাউদ)। প্রাক ইসলামী আরবগণের মধ্যে কন্যাকে জীবিত অবস্থায় কবরে সমাহিত করার যে কু-প্রথা প্রচলন হযরত রসূল করীম (সঃ) সেই ভয়াবহ কুপ্রথার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে কন্যা হত্যা চিরতরে বন্ধ করেন এবং সর্বপ্রথম ইসলামই নারীকে বিক্রয় পণ্যের বদলে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার করেন (কুরআন-৪ঃ১২)।

বর্তমান যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ ও ধর্মীয় সংস্কারক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই ধরা পৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়ে ইসলামের শিক্ষাকে পুনঃ জীবিত করার প্রেক্ষাপটে নারী সমাজের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে বলেন- মহিলাদের অধিকার যেভাবে ইসলাম সংরক্ষণ করেছে অন্য কোন ধর্ম তেমন কখনও করে নি। সংক্ষিপ্ত শব্দে আল্লাহ্‌তাআলা বলে দিয়েছেন **ওয়ালাহুল্লা মিসলুল্‌লাযীআলায় হিল্লা** অর্থাৎ যেভাবে পুরুষের মহিলাদের উপর অধিকার আছে তেমনি মহিলাদেরও পুরুষের উপর। কতক মানুষের অবস্থা শোনা যায় যে, তারা ঐ অসহায়দের (মহিলা) পায়ের জুতার ন্যায় মনে করে এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট সেবা তাদের থেকে নিয়ে থাকে। গাল মন্দ দেয়। তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে এবং পর্দার নির্দেশ এমন অন্যায়ভাবে পালন করায় যে, তাদের জীবিতই দাফন করে দেয়। অথচ সত্যিকার ও প্রকৃত দুই বন্ধুর ন্যায় স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর ব্যবহার হওয়া উচিত (মলফূযাত, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৪১৭-৪১৮)। অতঃপর তিনি (আঃ) আরও শিক্ষা দিয়েছেন যে, মহিলাদের প্রকাশ্য নির্লজ্জতা ব্যতিরেকে বাকী সমস্ত তিক্ততা এবং বৈরী আচরণ সহ্য করা উচিত। পুরুষ হয়ে মহিলার সঙ্গে ঝগড়া করাকে আমি অদ্ভুত নির্লজ্জতা মনে করি। আমাদেরকে পুরুষ হিসাবে সৃষ্টি করা বস্তুত আমাদের উপর খোদার পুরস্কারকে পরিপূর্ণ করা। এর কৃতজ্ঞতায় আমরা যেন মহিলাদের সঙ্গে কোমল এবং ভদ্র আচরণ করি (মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃঃ ১)। ফলে নারী সমাজ মানে-মর্যাদার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মনোবিজ্ঞানী ও দেহ বিজ্ঞানীদের মতে নারী ও পুরুষের গঠন প্রণালী প্রায় এক হলেও সৃষ্টির তারতম্য অনুযায়ী নারী ও পুরুষ একটু ভিন্ন। এই ভিন্নতার কারণে প্রকৃতি প্রদত্ত বিধান অনুসারে পরিবারের উপার্জনের ও ভরণপোষণের মূল দায়িত্ব পুরুষের উপর এবং মাতৃত্ব ও সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব নারীর উপর ন্যস্ত। তাই বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত মেয়ের ভরণপোষণের দায়িত পিতার উপর এবং বিবাহের পর হতে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর। হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেন, বিবাহের সময়ে সম্পাদিত শর্তাবলী আদায় করার ব্যাপারে খুব যত্নবান থাকবে (বুখারী)। অর্থাৎ বিবাহের পর স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ, আজীবন ভরণপোষণ, বাসস্থানের ব্যবস্থা ও স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা স্বামীর দায়িত্ব। সুতরাং নারীর জন্মকাল হতে আরম্ভ করে ইহজগতের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যাবতীয় ক্রিয়া কলাপের মাধ্যমে নারীকে সুখে শান্তিতে বাসবাসের শর্তমুখী সুযোগ-সুবিধা দেয়া পুরুষের কর্তব্য। আর কর্তব্য সঠিকভাবে পালনের জন্য পরিবারের কর্তৃত্বাধিকার পুরুষের উপর ন্যস্ত। কেননা কোন ব্যক্তিকে যদি কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে তাকে সেই কাজের কর্তৃত্বও দিতে হয়। দায়িত্বের সাথে কর্তৃত্বের সামঞ্জস্য না থাকলে এবং দুই জনের মধ্যে একজন নেতা মনোনীত না হলে দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া নারীকে মাতৃত্বের গুরু দায়িত্ব পালনের সাথে যদি পরিবারের উপার্জনের ও ভরণপোষণের মূল দায়িত্ব দেয়া হয় তবে তার উপর অবিচার করা হবে। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, পুরুষের নারীর উপর কর্তৃত্ব আছে, কেননা তাদের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, এজন্য যে, পুরুষ নারীর ভরণপোষণের জন্য অর্থ ব্যয় করে। সুতরাং ধার্মিকা নারী পুরুষের আদেশ মত চলবে এবং তার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্‌তাআলা যা সংরক্ষণ করতে বলেছেন তা রক্ষা করবে (৪ঃ৩৫)।

বলা বাহুল্য ইসলাম নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করার কারণে পুরুষের সংগতির যাইবে কোন জিনিষ দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা এবং অপ্রয়োজনীয় কোন কিছু চাওয়া ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। এতে নারী কর্তৃক পুরুষ নির্যাতন প্রকারান্তরে অন্যায় পথে উপার্জনে বাধ্য করা হয়। তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন- দেখ মুচি একটি জুতাতে অসততা করে কি কি পুরে দেয়, কেবল এ জন্য যে, এ থেকে যেন কিছু উপার্জন হয় আর তাতে স্ত্রী সন্তানের পেট ভরে। সৈনিক কেবল এ জন্য যুদ্ধে মাথা কর্তন করায় যেন কোনভাবে স্ত্রী সন্তানের ভরণপোষণ হয়। বড় বড় কর্মকর্তাকে ঘুষের দায়ে গ্রেফতার হতে দেখা যায়। সেটি কিসের জন্য হয়? মহিলারা বলে, আমার গহনা প্রয়োজন, কাপড় প্রয়োজন বাধ্য হয়ে অসহায় পুরুষকে ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু খোদাতাআলা এ পদ্ধতিতে রিযিক উপার্জন করা নিষেধ করেছেন (মলফূযাত নতুন সংস্করণ, পৃঃ ৩০৫)। তাই মহিলাগণকে সংযমী ও তাকওয়াশীল হওয়া প্রয়োজন। পরিশেষে বলা যায় ইসলাম নারীর অধিকার ও মর্যাদা বৃদ্ধি কল্পে আজীবন ভরণপোষানের দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করে দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালনের জন্য নির্ধারিত কর্তৃত্বাধিকার দিয়ে দৈনন্দিন জীবনে একে অপরের সহযোগী হিসাবে বসবাসের উত্তম ব্যবস্থা করেছে।

- মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

বিনয় ও নম্রতা-ই মনুষ্যত্বের মূল উপাদান

বিনয় এবং নম্রতা মানব চরিত্রের দর্পণ ও ভূষণ। মানব জীবনের উদ্দেশ্য সফলের জন্য বিনয় ও নম্রতা অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান। আদি কাল হতে আগত সকল মহামানবের সফলতার মৌলিক উপাদানের নাম বিনয় ও নম্রতা। যে যত বেশী বিনয় ও নম্র হয় ততই তার মর্যাদা এবং সৎ সাহস বৃদ্ধি পায়। কবির কথায়, "নিজেকে যে বড় বলে, বড় সে নয়, লোকে যাকে বড় বলে সেই বড় হয়। বড় হওয়া সংসারে কঠিন ব্যাপার, সংসারে সে-ই বড় হয়, বড় গুণ যার"। প্রকৃত মনুষ্যত্ব বোধ যদি কারো মধ্যে সৃষ্টি না হয় তবে তার বংশমর্যাদা বা আভিজাত্যের কোন মূল্য নেই। যে জন ফলবান বৃক্ষের ন্যায় গুণ ভারে নুয়ে পড়ে, অহংকার বা আমিত্বকে পরিহার করতে পারে সে-ই প্রকৃত মানুষ। আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন; "হে মানবমন্ডলী! নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে নর ও নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে সর্বাধিক মুত্তাকী" (হুজুরাত ঃ ১৩ আয়াত)।

একই উৎসের সৃষ্টি বিধায় মানুষ হিসাবে স্রষ্টার নিকট সবাই সমমর্যাদার অধিকারী। তবে এ মর্যাদা চামড়ার রং, ধন-সম্পদের পরিমাণ, সামাজিক পদবী এবং বংশ দ্বারা অর্জিত হয় না। স্রষ্টার নিকট মূল্যায়ণ হয় মনুষ্যত্বের। মর্যাদা ও সম্মানের মাপকাঠি হলো ব্যক্তির উচ্চমানের নৈতিক গুণাবলী এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালনের আন্তরিকতা।

ঔদ্ধত্য স্বভাবের মানুষকে কেহ ভালবাসে না। আল্লাহ্‌তাআলা নিজেও ঔদ্ধত্য স্বভাবী- সম্পন্ন লোকদের পসন্দ করেন না, তাই তিনি বলেছেন, "এবং তুমি মানুষের সামনে অবজ্ঞা ভরে নিজের গাল ফুলাবে না এবং ভূপৃষ্ঠে অহংকারের সাথে চলবে না। কোন দাম্ভিক অহংকারীকে আল্লাহ্ ভালবাসেন না"। দাম্ভিকতা চরিত্রের মাধুর্যকে নষ্ট করে, অহংকারকে বাড়িয়ে দেয়। অহংকার মানুষকে অধঃপতনের নিম্নস্তরে নিয়ে যায়। অহমিকায় মানুষ আত্মচিন্তায় বিভোর থাকে। অপরের প্রতি কর্তব্যবোধ ও পরমত সহিষ্ণুতা যা তাকে সমাজের কল্যাণকামী মানুষ রূপে গড়ে তুলতে পারে তা হতে আত্মম্ভরিতা ও অহংকার মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদিগকে জাহান্নামগামীদের সম্বন্ধে অবগত করবো? তারা হলো প্রত্যেক অহংকারী সীমালংঙ্ঘনকারী বদবখত ও ঔদ্ধত স্বভাবের মানুষ " (বুখারী ও মুসলিম)।

মহাজ্ঞানী সাধকগণের ভাষায় ঃ

"বিদ্যান হলো বিনয় জননী, বিদ্যায় জ্ঞানের প্রসার হয় এবং জ্ঞান মানুষকে বিনয়ী ভদ্র ও নম্রতার শিক্ষা প্রদান করে।" ঔদ্ধত্য অহংকারী স্বভাবের মানুষ অবিনয়ী অভদ্র এবং অনম্র হয়ে থাকে। তারা মানুষকে মানুষ বলে সম্মান দিতে পারে না। নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করে। ইসলাম বা মানবতার আদর্শ এটা হতে পারে না। ইসলামী আদর্শ হলো সকলের কল্যাণের ও মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীত যে প্রাণ তাঁর-ই অনুসরণ করা। মানব চরিত্রের যতগুলো ভাল উপাদান রয়েছে তন্মধ্যে বিনয় ও নম্রতা সর্বোচ্চে।

মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন ঃ "অতঃপর তিনি তাকে পূর্ণশক্তি দ্বারা সুগঠিত করলেন এবং উহাতে স্বীয় রূহ হতে ফুৎকার করলেন এবং তিনি তোমাদিগকে কান, চক্ষু এবং হৃদয় দান করলেন" (সূরা আস্ সাজদা ১০)। মানুষ স্বীয় চেষ্টা সাধনা এবং স্বাধীন চিন্তা-চেতনা দ্বারা স্রষ্টা বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত হবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন **আশরাফুল মাখলুকাত** বা সৃষ্টির সেরা হিসাবে। আল্লাহ্‌র এ ভালবাসা ও অনুগ্রহের মর্যাদা রক্ষা করে আজীবন মনুষ্যত্ব অর্জনের সাধনায় নিজকে ব্যাপৃত রাখারই অন্য নাম ইসলামী জীবন বিধান। পরোপকার পরকল্যাণ অহমিকায় বা দাম্ভিকতা দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না। দাম্ভিকতা জীবনে ধ্বংস ও অকল্যাণ ডেকে আনে। যিনি ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বস্তরের মানুষকে ভালবাসতে পারেন তিনিই প্রকৃত মানুষ। এ অসাধ্য কাজটি শুধুমাত্র বিনয় ও নম্রতা দ্বারাই সম্ভব। উদ্ধত, দাম্ভিক ব্যক্তিকেও কেহ ভালবাসে না। সবাই তাকে ঘৃণা ও অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমে বলেছেন; "হে পরোপকারীগণ! তোমাদের দানসমূহের ভিত্তি অকপটতার উপর হওয়া প্রয়োজন। উপকারকে স্মরণ করিয়ে মানুষের মনে দুঃখ দিয়ে উহার নেকীকে ধ্বংস করবে না" (সূরা বাকারা ঃ ১৬৫)।

সর্বাবস্থায় অহংকার, কপটতা ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা পরিতাজ্য। কেননা অহংকারীর দান-খয়রাতও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অপসন্দনীয়। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "আমার রব ওহীর মাধ্যমে আমাকে বলেছেন যে, তোমরা পরস্পরের সাথে বিনয় ও নম্রতার আচরণ কর। যাতে কেউ কারো উপর গৌরব না কর এবং একজন অন্যজনের উপর বাড়াবাড়ি না কর (মুসলিম)। কুরআন করীমে বলা হয়েছে, "তারাই রহমান আল্লাহ্‌র বান্দা যারা জমিনের উপর নম্রভাবে চলাফেরা করে" (বনী ইস্রাঈল)। হযরত লুকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, "বৎস! দুনিয়াতে পা ঠুকে চলবে না কারণ তুমি পর্বত অপেক্ষা উঁচু হতে পারবে না কিংবা জগতটাকে ধ্বংসও করতে পারবে না (সূরাতু লুকমান)। প্রত্যেক মানুষের স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রতিটি মানুষই স্রষ্টার সৃষ্টি **আশরাফুল মাখলুখাতের** অংশ। স্রষ্টার পরেই মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। এদের স্থান ফিরিশ্‌তা হতে বহুগুণ উর্ধ্বে। তাই মানুষ হিসাবে নিজ অপেক্ষা অপরকে হেয় মনে করার কোন অবকাশ নেই। সর্বযুগ ও কালের মহামানব এ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, রহমাতুল্লিলআলামীন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মানব জাতির সামনে ঘোষণা করতে বলা হয়েছে, তুমি বল **আনাবাশারুম মিসলুকুম**, অর্থাৎ "আমিও তোমাদেরই মত একজন মানুষ, তবে আমার প্রতি ওহী করা হয় যে, তোমাদের মাবূদ একজনই মাবূদ" (সূরা কাফ ঃ ১১১)। একবার চিন্তা করা দরকার। যাঁর কল্যাণে সমগ্র নভোমন্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তিনি কখনো স্বীয় মান-মর্যাদাব গর্বে নিজকে অপর হতে পৃথক সত্তা হিসেবে চিন্তা করেন নি। অতএব বাকী সবাইত তাঁর পদতলের ধূলি অপেক্ষাও নগণ্য। তাদের কোন ক্রমেই অপরের প্রতি রুক্ষতা প্রদর্শন মানায় না। বিনয় ও নম্রতা দ্বারা মানুষ পরম -শত্রুকেও বন্ধুতে পরিণত করতে পারে। আর অহমিকা পরম বন্ধুকেও শত্রুতে রূপান্তরিত করে দেয়। কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে,"ভাল এবং মন্দ সমান নয়; অতএব তুমি উহা দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর যা সর্বাপেক্ষা উত্তম। ফলে সহসা ঐ লোক যার মধ্যে এবং তোমার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে" (হামিম আস্ সাজদাঃ ৩৫)। পরম সাধনায় লিপ্ত সাধকও যদি আমিত্ব বা দাম্ভিকতাকে বিসর্জন দিতে সক্ষম না হয় তবে তার সাধনা বিফল হতে বাধ্য। আবার অতীব সাধারণ মানুষও যদি মনুষ্যত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মম্ভরিতা বিসর্জন দিয়ে বিনয় ও নম্রতার পোষাক পরিধানে সক্ষম হয় তবে তার পক্ষেও সম্মানের সুউচ্চ মিনারাতে আরোহণ করা সম্ভব। হিংস্র ও রুক্ষ মেজাযের মানুষ যেমন দুনিয়াতে প্রকৃত সম্মান অর্জনে ব্যর্থ হয়। তেমনিভাবে পরকালেও মহাসম্মানের পুরস্কার জান্নাত লাভে

ব্যর্থ হবে। কারণ অহিংস জীবন ব্যবস্থার মহানায়ক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যার ভিতরে সরিষা সম অহংকার বিদ্যমান থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না (বুখারী)। মুসলিম জাহানের প্রাণ প্রিয় ইমাম হযরত আমীরুল ম'মিনীন উমর (রাঃ) একদা জুমুআর খুতবায় বললেন, হে মানুষ! তোমরা নম্রতা অর্জনে ব্রতী হও। কারণ আমি আমার প্রিয় বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হতে শ্রবণ করেছি, "যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বিনয়ী ও নম্রতা অবলম্বন করে তবে আল্লাহ্ তাকে মান মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং যে অহংকারী হয় আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করেন। সে নিজেকে নিজে বড় মনে করে কিন্তু লোক চক্ষে হেয় বিবেচিত হয়" (হায়াতুস্ সাহাবা)। যে ব্যক্তি স্বীয় সম্মানের অহমিকায় অন্যের প্রতি অহংকারবশতঃ যুলুম করে, সে যতই ইবাদত বন্দেগী করুক না কেন তার পক্ষে খোদাতাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কিশ্‌তিয়ে নূহ্ পুস্তকে বলেছেন, "কোন পাপাচারী অহংকারী অত্যাচারী ও বিশ্বাসঘাতক খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না।" মানুষ সামাজিক জীব। তাই সমাজের প্রতিটি স্তরেই রয়েছে তার অসংখ্য গুরু-দায়িত্ব। আদিকাল হতে মানুষের সামাজিক দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রসূল আগমন করেছেন। তাঁরা মানুষকে যে সকল সবক প্রদান করেছেন উহার মূলমন্ত্র হলো প্রেম প্রীতি, বিনয় ও নম্রতা। যখনই মানুষ সামাজিক মূল্যবোধের এ সকল মূলনীতি বিসর্জন দিয়ে আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের দাসত্ব শুরু করে তখনই সমাজে অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠে। তাই বার বার কুরআন করীমে বলা হয়েছে হে মানুষ! তোমরা কি অহংকার কর? তোমরা কি ভুলে যাও যে, তোমাদিগকে নগণ্য পূঁতিগন্ধময় শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করা হয়েছে তবুও তোমরা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হচ্ছ। দাম্ভিকতা, অহংকার, ঔদ্ধত্য, ক্রোধ, যুলুম, নির্যাতন এবং লোভ - লালসা শয়তানী সিফত। ইহার লালন বা অনুশীলন মু'মিনের জন্য নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তির মধ্যে এ সকল শয়তানী সিফত বিদ্যমান, তার নিকট হতে খোদায়ী সিফত দয়া-মায়া, মমতা, সমতা, ঔদার্যের আশা তারাই করতে পারে যারা পাগল। প্রতিটি মানুষের উচিত মানব কল্যাণবিরোধী শয়তানী সিফত বর্জন করে খোদায়ী সিফতের মাধ্যমে নিজেকে মানবতার সেবায় নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত করা। মানব সেবা দ্বারাই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় এবং যে সাধনা বা কর্ম দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় উহারই নাম প্রকৃত ইবাদত। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ্ বলেনঃ "ইজ্জত ও মাহাত্ম্য হচ্ছে আমার পায়জামা। অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে আমার চাদর। যে এ দু'টির কোন একটিতে আমার সাথে প্রতিযোগিতা বা সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, আমি তাকে শাস্তি দিব" (বুখারী ও মুসলিম)।

দাম্ভিকতা ও অহংকারের পরিণতি অনিবার্য ধ্বংস। কাউকে অহংকারবশতঃ তুচ্ছ জ্ঞান করা কোন জ্ঞানী লোকের কাজ হতে পারে না। হযরত উমর (রাঃ)-এর ন্যায় মহান খলীফা রাষ্ট্রীয় সফরে পালাক্রমে খাদেমের সাথে উঠের পিঠে আরোহণ করেছেন। আগত অতিথিকে স্বাগতম জানাতে এলে খাদেম উঠের পিঠে বসা অবস্থায় বলে উঠেছে আমি নইকো খলীফা, খলীফা যিনি তার হাতে ধরা উঠের রশি। এমন অনেকে ছিলেন এবং বর্তমানেও আছেন যারা ক্ষমা-মায়া-মমতা ও সহিষ্ণুতার গুণে সারা বছর রোযাদার এবং সারারাত দাঁড়িয়ে ইবাদত- কারীর সমমর্যাদা লাভ করেছেন। এরাই হলেন সত্যিকার অর্থে রহমান খোদার বান্দা। হযরত উমর (রাঃ)-এর নিজের দু'টির বেশি জামা ছিল না। একটি গৃহে পরিধান করতেন অপরটির দ্বারা জুমুআর খুতবা দিতেন। তিনি তাঁর অধীনস্থদের নসীহত করতেন, "মনে রাখবে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজের ক্রোধকে হজম করে ফেলেন, তবে আল্লাহ্ তার অন্তর ঈমান ও রহমতে পূর্ণ করে দিবেন।" "যে ব্যক্তি অন্যের উপর ক্রুদ্ধ অথচ নিজের প্রতি আল্লাহ্‌র ক্রোধের কথা ভুলে যায় তার অবস্থা বড়ই আফসোসজনক।" হযরত লুকমান হেকীম বলেছেন, আমি আহমক হতে জ্ঞান অর্জন করেছি। যার সহজ-সরল অর্থ হলো, আহমক যা করে তার বিপরীত কাজ সাধন করলেই বুদ্ধিমান হওয়া যায়। ইমামে আযম হযরত আবূ হানীফা (রহঃ) পথ চলা মাতাল হতে সবক গ্রহণ করে স্বীয় জীবনের গতি পরিবর্তন করেছিলেন। এসব কার্য তখন সম্ভব যখন অন্তরে বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান থাকে। অহমিকা ধ্বংসের বীরসেনা পতি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে যুগ-সন্ধিক্ষণে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন তখনতো মনিব তার দাসদের মানুষই মনে করত না। কিঞ্চিৎ অপরাধের করণেই গরু-ছাগলের ন্যায় বাজারে নিয়ে তাদের বিক্রি করা হ'ত। চাবুকের আঘাতে উঠিয়ে নেয়া হত অসহায় মানুষগুলোর পিঠের চামড়া। সেই যুগে একদা চলার পথে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পাদুকার ফিতা ছিঁড়ে গেলে খাদেম বা সাহাবী হযরত আবূ আমের (রাঃ) উহা হাতে করে বহন করতে চাইলে হুযূর (সঃ) তার হাত হতে পাদুকাটি কেড়ে নিয়ে বললেন,আমি কোন স্বাতন্ত্র্যকে পসন্দ করি না। আমার বোঝা আমাকেই বহন করতে দিন (হায়াতুস্ সাহাবা)। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পদাঙ্ক অনুশীলনে আগমনকারী খাদেম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) একবার লাহোর সফরে গেলে ভক্তকুলের কতিপয় যুবক সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমরা অন্যজাতির নেতার ন্যায় আজ আমাদের নেতাকে ঘোড়ার গাড়ীতে বসিয়ে ঘোড়ার পরিবর্তে নিজেরাই গাড়ী টানব।

হুযূর (আঃ) ঘোড়ার গাড়ীর নিকট গমন করে যখন তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেলেন তখন বললেন, "ঘোড়ে জোতো হাম ইনসান কো হায়ওয়ান বানানে কে লিয়ে দুনিয়ামে নেহী আয়ে। হামতো হায়ওয়ান কো ইনসান বানানেকে লিয়ে আয়ে হ্যাঁয়। অর্থাৎ ঘোড়া জোতে দাও। আমি মানুষকে পশুতে পরিণত করতে আসি নি। আমি এসেছি পশুকে মানুষে পরিণত করতে (সুলতানুল কলম)।

বিনয় ও নম্রতা ছাড়া এহেন লোভনীয় সম্মান দানের পদ্ধতিকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করা কখনোই সম্ভব নয়। রুক্ষ ও কর্কশ স্বভাবের মানুষ ইমামতীর দায়িত্বে নিয়োজিত হলে সফলতা অর্জন করতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে অনাগত ভবিষ্যতে মনোনিত ইমামগণকে বলা হয়েছে, "যদি তুমি তাদের প্রতি রুক্ষ এবং কঠোর চিত্ত হতে তবে নিশ্চয় তারা তোমার চারিপার্শ্ব হতে ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে পড়তো অতএব তুমি তাদিগকে মার্জনা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর" (সূরাতু আলে ইমরান ঃ ১৬০)।

কেউ যদি বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে অধীনস্থদের সাথে কোমল ব্যবহারের পরিবর্তে বিদ্যা বা ধনের অথবা পদের কারণে তার ব্যবহারকে অহংকার, দাম্ভিক, ঔদ্ধত্য ও কর্কশ করে তোলে তবে তার দ্বারা কেউ নেক কাজের প্রতি আকৃষ্ট হবে না। কাজেই প্রতিটি মানুষকেই বিশেষ করে যাদের হাতে সমাজের ভাগ্য জড়িত তাদের উচিত আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সিদ্ধির ও প্রকৃত মু'মিনিয়ত হাসিলের লক্ষ্যে আমিত্ব, দাম্ভিকতা ও অহমিকার পরিবর্তে বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে নিজেকে একজন সত্যিকার ভদ্রলোক হিসাবে গড়ে তোলার সাধনায় ব্রতী হওয়া। যার বদৌলতে আল্লাহ্‌র প্রকৃত আবেদ হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব। মূল কথা হলো, "বিনয়েই জয় আর অহংকারে ক্ষয়"-এ কথাটি সদাসর্বদা স্মরণ রাখলেই মানুষ অহমিকার পথ পরিহার করে বিনয় ও নম্রতার ভূষণে ভূষিত হতে পারবে। আর এতেই জগতে চিরঅমরত্ব লাভের দ্বার উম্মুক্ত হবে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে এর তৌফীক দান করুন।

- মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম
মোয়ালেম

ওয়াকফে আরযী স্কীমে অংশগ্রহণের অনুরোধ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) জামাতের তা'লীম-তরবিয়তের কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে এবং ওয়াকফে আরযী স্কীমে অংশগ্রহণকারী মুজাহেদীনের আত্ম-সংশোধনের এক নতুন জীবনের স্বাদ গ্রহণের নিমিত্তে এই মোবারক স্কীম জারী করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ স্কীমটি এত বেশী প্রয়োজন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইতঃপূর্বে আমরা প্রত্যেক জামাতে ওয়াকফে আরযী স্কীমে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন ফরম পাঠিয়েছিলাম। অল্প সংখ্যক ভ্রাতা ব্যতীত আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি।

অতএব সকল স্থানীয় জামাতের আমীর / প্রেসিডেন্ট / আনসারুল্লাহ্ যয়ীম / খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট অনুরোধ, আপনারা আপনাদের জামাতের / মজলিসে উক্ত ওয়াকফে আরযী স্কীমে অংশগ্রহণের জন্য ভ্রাতাদের অনুপ্রাণিত করতে সচেষ্ট হবেন।

সম্প্রতি খুলনা জামাতের জনাব নাসিরউদ্দিন, জনাব শহিদুল ইসলাম ও জনাব ইনশান আলী এ মহতী স্কীমে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন। মোকাররম ন্যাশনাল আমীর সাহেব যথারীতি তাদেরকে সুন্দরবন ও রঘুনাথপুর বাগে ওয়াকফে আরযী স্কীমে অংশগ্রহণ এর জন্য অনুমোদন দিয়েছেন। এর আগে গত বছর ঢাকার উত্তর বাহের চর জামাতের জনাব শরীয়ত উল্লাহ্ ও জনাব আল্ আমীন, পাবনা জামাতের জনাব আবদুস সাত্তার, মাহীগঞ্জ জামাতের জনাব মিজানুর রহমান, জনাব খলিলুর রহমান ও জনাব আমজাদ হোসেন, ওয়াকফে আরযী স্কীমে অংশগ্রহণ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

তাই ভ্রাতাগণের সমীপে আরজ, আপনারা নিজ নিজ জামাতের মাধ্যমে 'ওয়াকফে আরযী' স্কীমে অংশগ্রহণ-এর জন্য মোকাররম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিকট আবেদন করবেন। যারা এই স্কীমে অংশগ্রহণ করছেন তাঁদের জন্য সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

- মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত

আতফাল দিবস পালিত

মুসলিম খোদ্দামুল আহমদীয়া বি.বাড়ীয়ার উদ্যোগে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে গত ৩০/৫/২০০১ইং তারিখ রোজ বুধবার বাদ ফজর থেকে 'আতফাল দিবস' ২০০১ শুরু হয়। ফযরের পর মার্চপাস্ট, পতাকা উত্তোলনের পর উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। আতফালের সদস্যদেরকে ৩টি গ্রুপে ভাগ করে কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, অর্থ সহ ও অর্থ ছাড়া নামায কুইজ, আযান, ইকামত ও বিভিন্ন খেলাধূলার প্রতিযোগিতা হয়। বিকাল ৪.৩০ ঘটিকায় সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত আতফাল দিবসের পরিসমাপ্তি ঘটে। এতে ৭০ জন আতফাল উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও স্থানীয় আমীর জনাব খন্দকার সাঈদ আহমদ, রিজিওনাল কায়েদ জনাব খন্দকার মোস্তাক আহমদ, জেলা কায়েদ জনাব মাসুম আহমদ, স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব মজিদুল ইসলাম ও স্থানীয় কায়েদ জনাব হাফিজুর রহমান সাহেব উক্ত দিবসে সার্বিক তত্ত্বাবধানের কাজ করেন।

- বশির আহমদ মিঠু

জার্মানীর সালানা ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে অত্যন্ত আনন্দঘন ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানীর ২২তম সালানা ইজতেমা গত ১৫, ১৬ ও ১৭ই জুন, ২০০১ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার দেশের "বাদ ক্রোয়েজনখ" শহরের একটি বিশাল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

নতুন সহস্রাব্দের এই প্রথম ইজতেমায় জার্মানীর ২৫৪টি মজলিস থেকে প্রায় ছয় হাজার খোদ্দাম, আতফাল অংশগ্রহণ করে। এছাড়া জার্মান মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার আমন্ত্রণে যুক্তরাজ্য মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার জাতীয় ফুটবল দলসহ সে দেশের সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া জনাব ইব্রাহীম মোনেম, বেলজিয়াম মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার জাতীয় ভলিবল দলসহ সেদেশের সদর মজলিস ডাঃ ইদ্রিস আহমদ এবং ফ্রান্স মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর জনাব ফাহীম নিয়াজ ইজতেমায় উপস্থিত থেকে জার্মান মজলিসের ২২তম ইজতেমাকে ইউরোপিয়ান ইজতেমার রূপ দান করে।

তিনদিনের এই ইজতেমার ব্যাপক আয়োজনের সর্বত্র নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়া চোখে পড়ার মত। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম সহ বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ের প্রতিযোগিতার সাথে সাথে খোদ্দাম ও আতফাল বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে জার্মান বনাম যুক্তরাজ্যের ফুটবল ম্যাচ এবং জার্মান বনাম বেলজিয়ামের ভলিবল ম্যাচ দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। উভয় খেলায় জার্মান দল বিজয়ী হয়। স্থানীয় শহরের সম্মানীত মেয়র তাঁর সহকারী সহ ইজতেমা গাহ্ পরিদর্শনে আসেন।

ইজতেমার প্রোগ্রামসমূহের মধ্যে ১৬ই জুন শনিবার খোদ্দামুল আহমদীয়ার আহাদ নামার উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত এক ঘন্টার একটি প্রামাণ্য চিত্র উপস্থিত খোদ্দাম, আতফাল ও আনসারগণের মধ্যে মর্মস্পর্শী আবেদন সৃষ্টি করে।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানীর সদর জনাব মাহমুদ আহমদ এর ধন্যবাদ জ্ঞাপক বক্তৃতা এবং জার্মানীর আমীর জনাব আব্দুল্লাহ ওয়াগিস হাউসার এর নসীহতমূলক সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে এই অসাধারণ সাফল্যজনক ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

- এন. এ. শামীম আহমদ
বেলজিয়াম

বর্তমান সমস্যা জর্জরিত বিশ্ব সভ্যতার সংকট মোচন কল্পে ধর্মীয় সংলাপের গুরুত্ব অপরিসীম

চট্টগ্রামে প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত আহমদীয়া জামাত আমন্ত্রিত

গতকাল ১৬ জুন শনিবার কারিতাস-চট্টগ্রাম মিলানায়তনে সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রীতি সম্মিলনে ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, বাহাই ধর্ম, শিখ ধর্ম সহ বিভিন্ন বিশ্বাসের প্রতিনিধিগণের চারটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯ টায় চট্টগ্রামের বিশপ প্যাট্রিক ডি রোজারিও শান্তির প্রতীক শ্বেতকপোত উড়িয়ে এবং কেন্দ্রের সভাপতি প্রফেসর ড. মনজুর মোরশেদ মাহমুদ জাতীয় পতাকা ও সম্মিলনের আহবায়ক বাদল বড়ুয়া বিভিন্ন ধর্মের চিহ্ন খচিত সম্প্রীতি পতাকা উত্তোলন করে এ সম্মিলন উদ্বোধন করেন। প্রফেসর ড. মনজুর মোরশেদ মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রের সচিব মওলানা মুহম্মদ ইউসুফ। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ ও পরিচিতি প্রদান করেন ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের মিশনারী ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, আচার্য ব্রজেশ্বরানন্দ অবধূত, ফাদার রবার্ট গণছালভেছ, পেহলাজ কে. প্রেমী, শ্রীমৎ শাসনপ্রিয় মহাস্থবিরের পক্ষে রাখাল বড়ুয়া, ভাই অমরজিৎ সিং এর পক্ষে বিজয় সিং। তাঁরা স্ব স্ব ধর্মের উদার ভাবগুলোর মানবিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্বারোপ করেন। উদ্বোধনী ভাষণে বিশপ প্যাট্রিক ডি' রোজারিও পারস্পরিক ধর্মীয় সংলাপের ভিত্তিতে নতুন এক বিশ্বসভ্যতা গড়ে তোলার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মনুষ্যজাতির অভিবাসন বৈশিষ্ট্য আজ নব নব সাংস্কৃতিক সংকট ও জীববৈচিত্রের জন্ম দিচ্ছে।

'বর্তমান বিশ্বে ধর্ম জগতে সমন্বয়বাদ' শীর্ষক দ্বিতীয় অধিবেশনের মূলসুর ছিল বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যসাধন। বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুভবের উপর বক্তাগণ বিস্তৃত আলোচনা করেন ধর্ম ও বাস্তবজগতের ঐক্যসূত্রের আলোকে। বিপ্লবী শ্রী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে ফাদার ফিলিপ ডি' রোজারিও সাংবাদিক বিমলেন্দু বড়ুয়া, চট্টগ্রাম আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আমীর জনাব মোবাশ্বেরুর রহমান প্রমুখ আলোচকবৃন্দ সমন্বয় গড়ে তোলার জন্য শক্তিশালী সমন্বয়ক, সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তাবোধ, সমন্বয় চেতনাবোধ এবং সমন্বয়ের অপরিহার্যতাবোধের জরুরী প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন, সর্বধর্মের শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান, পারস্পরিক মর্যাদার স্বীকৃতি ও মানুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতির গুরুত্ব সমন্বয়বাদের জন্য আবশ্যক। আধুনিক বিশ্বে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সব ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানার্জন, পারস্পরিক সংযম ও শ্রদ্ধাবোধ, উচ্ছৃঙ্খলতা ও সমালোচনা বর্জন ইত্যাদির পাশাপাশি জীবন ও কর্মভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ উচিত বলে তাঁরা মন্তব্য করেন।

বিকেলে শ্রী বাদল বড়ুয়ার সভাপতিত্বে 'আধুনিক যুবমানসে ধর্মবোধ, বিষয়ক তৃতীয় অধিবেশনে বক্তাগণ হতাশাগ্রস্ত বিভ্রান্ত যুবসমাজকে নবশক্তিতে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য সুস্থ ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। যুবসভায় আলোচনা করেন মওলানা সৈয়দ আমজাদ হোসাইন, মি. জেমস্ গোমেজ, অধ্যাপক স্বরূপানন্দ রায়, অধ্যাপক তুষার কান্তি বড়ুয়া।

মানবিক ধর্মবোধ প্রতিষ্ঠায় নারী সমাজের ভূমিকা বিষয়ক চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বেগম মুশতারি শফি। আলোচনায় অংশ নেন মিসেস মাজগান সামছি বাহার, অধ্যক্ষ রীতা দত্ত, অধ্যক্ষ প্রীতিকণা বড়ুয়া, সিনথিয়া রোজারিও। আলোচকগণ পৃথিবীর নারী সমাজকে সম অধিকার ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে বিশাল সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার উপর জোর দেন। সমাজে নতুন মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে নারী সমাজ কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম বলে তাঁরা উল্লেখ করেন।

সম্মিলনে ভারত, পাকিস্তান, ইরান সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১৫০ জন প্রধিনিধি যোগদান করেন।

- আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া প্রেরিত

শুভ বিবাহ

গত ১৮/০৬/২০০১ইং রোজ সোমবার ঢাকা জামাতের আশকোনা হালকার মরহুম আব্দুল খালেক সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা মোসাম্মৎ মিনহাজ আক্তারের বিবাহ মোঃ মজিবর রহমান পিতা- মোঃ সাউদুল ইসলাম, পুরুলিয়া, নাটোর-এর সাথে ৭৫,০০০/= টাকা মোহরানা ধার্যে কন্যার পিত্রালয়ে সুসম্পন্ন হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্।

উক্ত বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য জামাতের সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

- আব্দুল কাদির ভূইয়া
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশ্তানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

❑ আমাদের ছোট ভাই মোঃ রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া, নায়েব কায়েদ, ঢাকা রিজিওন এর সাথে মোসাম্মদ সাইদা আক্তার শাওন, পিতা এডভোকেট শাহাদত হোসেন খন্দকার, রাজশাহী-এর বিয়ে গত ০৮/০৩/২০০১ইং তারিখে ৪৫,০০১/= টাকা দেনমোহর ধার্যে কনের নিজ বাসভবনে সুসম্পন্ন হয়। কনে মৌঃ আবদুল হাই, কিশোরগঞ্জ-এর মেয়ের ঘরের প্রথম নাত্নী। বিয়ে পড়ান নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম। বিয়ের অনুষ্ঠানে রাজশাহী জামাতের সকল কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বিবাহ আল্লাহ্তাআলা যেন সর্বময় মঙ্গল করেন সেজন্য সকলের সমীপে খাস দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

- মোঃ খলিলুর রহমান ভূঁইয়া
মোসাম্মদ শাহনাজ পারভীন ভূঁইয়া
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর

খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮২৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য

যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর

অব্যাহত অগ্রযাত্রায়

আমাদের

অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAIFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

সদ্য সমাপ্ত মোয়াল্লেম ট্রেনিং -এর সমাপনি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী। ছবিতে সংশ্লিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ,প্রিন্সিপাল, শিক্ষকবৃন্দ এবং মোয়াল্লেমদের কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে।

ট্রেনিং সমাপনের পর মোয়াল্লেমদের মাঝে ন্যাশনাল আমীর ট্রেনিং কমিটির চেয়ারম্যান, সদস্য এবং প্রিন্সিপাল মাওলানা সালেহ আহমদকে দেখা যাচ্ছে।

হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধিকে উপহার প্রদান করছেন মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর আবুল কালাম আজাদ। ছবিতে নায়ের সদর ও আমেলার সদস্যদেরকে দেখা যাচ্ছে।

হুযূর আকদস (আইঃ)-এর বিশেষ প্রতিনিধি, মাওলানা হাফেয মোজাফ্ফর আহমদ, নাযের দাওয়াত ইলাল্লাহ্-এর সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর ও ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সদস্যদেরকে দেখা যাচ্ছে।

New Vol. No. 64 ❑ 1st Issue

July 15, 2001 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

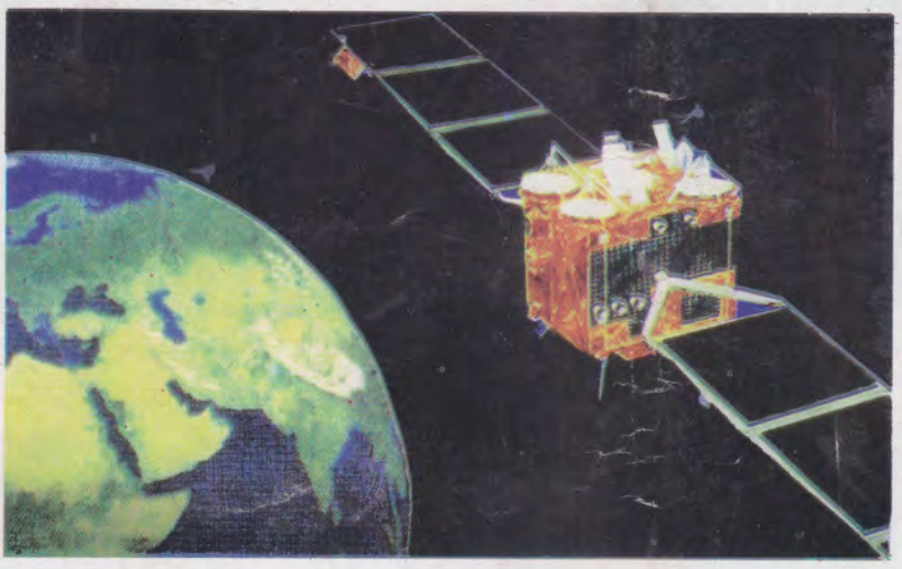

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ MTA-এর দর্শকদের জন্য সুখবর!

এমটিএ MTA আন্তর্জাতিক স্যাটালাইট টেলিভিশন প্রযুক্তি আর উৎকর্ষের পথে আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে। এশিয়ার দর্শকদের জন্য গত ১৩ই মার্চ, ২০০১ থেকে এম টি এ ডিজিটাল সম্প্রচার আরম্ভ করেছে (আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌)। এর পাশাপাশি এনালগ সম্প্রচার আগের মতই আগামী কয়েকমাস চালু থাকবে। তাই দর্শকদের কাছে ডিজিটাল সিস্টেমে যাবার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে আছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। DIGITAL সম্প্রচার ধারণ করতে আপনার কেবল একটি নতুন DIGITAL RECIEVER SET লাগবে। DISH আর LNB অপরিবর্তীত থাকবে। নতুন RECIEVER-এর মূল্য প্রায় এগার হাজার টাকা পড়বে।

আকাশে এমটিএ-এর নতুন ঠিকানা ঃ

MTA INTERNATIONAL (DIGITAL)
SATTELLITE : ASIASAT 2
POSITION : 100.5^0 EAST
SYMBOL RATE : 27500
DOWN LINK FREQ : 3660 MHZ
POLARITY : VERTICAL
PID : AUTO & OTHER NOS.
FEC : 3/4

ডিজিটালে দশ ফিট ডিশে অত্যন্ত স্বচ্ছ আর স্পষ্ট ছবি ও শব্দ ধারণ করা যায়। একই FREQUENCY -তে সউদী টিভি চ্যানেল 'ওয়ান' ধরা যায়। সমস্ত কেবল টিভি ব্যবসায়ীরা এই স্যাটেলাইট ধরে থাকেন।

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	:	6.50 MHz
* English	:	7.02 MHz
* Arabic	:	7.20 MHz
* Bangla	:	7.38 MHz
* French	:	7.56 MHz
* German	:	7.74 MHz
* Indonesian	:	7.92 MHz
* Turkee	:	8.10 MHz

MTA-তে প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষাভাষী দর্শক - শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন আহবান করা যাচ্ছে। নিম্ন ঠিকানায় প্রশ্ন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

প্রতিটি ঘরে এমটিএ-এর সংযোগ নিন এবং নিয়মিত অনুষ্ঠান মালা দেখুন। পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯ ফ্যাক্স ঃ ৭৩০০৯২৫

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211

Phone : 7300808, 7300849 Fax : 7300925 E-mail : amgb@bol-online.com